স্বপনবুড়োর শৈশব



স্বপনবুড়ো

স্বপনবুড়োর শৈশব



—স্বপনবুড়ো

॥ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি ঃ কলিকাতা ১২ ॥

॥ প্রথম প্রকাশ ॥

॥ মহালয়া ঃ ১৩৬২ ॥

॥ দাম ঃ তিন টাকা ॥

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধীরেন্দ্রকুমার রায় কর্তৃক নবকুমার প্রিন্টিং ওয়ার্কস ২এ, কেদার দত্ত লেন কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত



4031

ভারতের
বিভিন্ন অঞ্চ-
লের ছেলেমেয়েদের
অনুরোধে আর তাগিদে একদিন
স্বপন-বুড়োর ছেলেবেলাকার কাহিনী
শোনাতে সুরু করেছিলাম। আজ
সেই গল্প বলা যখন শেষ হল—তখন তাদের
কথাই সকলের আগে মনে জাগল।
কাছের আর দূরের সেই হাসি-
মুখ কিশোর-কিশোরীদের
হাতে তুলে দিলাম
স্বপনবুড়োর
শৈশব

স্বপনবুড়োর অন্যান্য বই !

উপন্যাস

বাস্তুহারা
বনপলাশীর ক্ষুদে ডাকাত
পঙ্ক থেকে পদ্ম জাগে
বেপরোয়া
শশী-শ্যামলের সাঁকো
উড়ন্ত চাকি

কৌতুক-উপন্যাস

খস্তি ছেলে

গল্প

স্বপনবুড়োর গল্প-সঞ্চয়ন
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
স্বপনবুড়োর হাসির গল্প
স্বপনবুড়োর মজার গল্প

জীবনী

স্বপনবুড়োর শৈশব

বড়দের জন্য

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ
তবু রঙ্গ ভরা

নাটক

এশিয়ার নৃত্যছন্দ
আত্মহত্যা
প্রতিশোধ
বাপ্পাদিত্য
মহাপূজা
তাল-বেতাল
স্বপনবুড়োর শিশু-নাট্য

হাসির কবিতা

স্বপনবুড়োর হুল্লোড়

ছড়া

স্বপনবুড়োর ছড়া

খুব ছোটদের বই

পড়াশোনা

গান

স্বপনবুড়োর গান ও স্বরলিপি

যন্ত্রস্থ

স্বপনবুড়োর ঝুলি
ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি

ভ্রমণ কাহিনী

সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে
দেশে দেশে মোর ঘর আছে

এ কোন্ পটে আঁকা—কী রঙের কেমন ছবি?

যত দূরে চলে যাই তত জোরালো—তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে!

সেই আমার শৈশবের ছবি। তারই কথা বলব আজ সঙ্গোপনে। শহরের কল-কোলাহলে কতটুকুই বা এর মূল্য?

তবু গাঁয়ের কথা শুন্তে যাদের ভালো লাগে···সেই হাজার হাজার ছেলেমেয়ের দল এগিয়ে আস্বে; তাদের উৎসুক মুখ, ব্যগ্র চোখ আমি আমার মনের আয়নায় দিব্যি দেখ্তে পাচ্ছি।

আমার চার পাশ দিয়ে ঘিরে বস্ল তারা। কত তাদের প্রশ্ন, কত তাদের জিজ্ঞাসা। বুক-ভরা কৌতূহল নিয়ে তারা শুন্তে চায় আমার শৈশবের কাহিনী। আজকের দিনের ছেলেমেয়ে যারা তাদের শৈশবের সঙ্গে কিন্তু আদপেই মিলবে না! সব ঘটনা যে সন-তারিখ মিলিয়ে লেখা হবে তাও বলা যায় না। যে ছবি মনের পটে ভেসে উঠ্বে তারই কথা বল্ব আমার কিশোর-কিশোরী বন্ধুদের কাছে।

রাজধানী কল্কাতার চোখ-ধাঁধানো আলো থেকে অনেকখানি দূরে—একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ে।

এখানে পৌঁছুতে হলে আজকের দিনেও সব রকম যান-বাহনে চড়তে হয়। ট্রেন, ষ্টীমার, নৌকা···তার পর পায়ে-চলা পথ!

সেইখানে মিল্বে আমার ছেলেবেলাকার নিরালা, সবুজ ঘোম্টা-ঢাকা খাল-বিল বহুল লাজুক গ্রামটি!

আজকের দিনে ভারতবর্ষের ম্যাপে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আছে সে লুকিয়ে পূর্ব্ব-পাকিস্তানে। ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার ভেতর সাকরাইল নামে একটি নীরব নিঝুম গ্রাম—যার পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ধান, গরুর দুধ আর চম্চমের জন্যে আজও প্রবাসী সন্তানদের রসনা লালা সিক্ত হয়ে ওঠে।

—শরীর খারাপ হয়েছে? তা যাও না, মাস খানেক দেশে কাটিয়ে এসো। মাছ, দুধ, ঘী পেটে পড়লেই রোগ-বালাই পালিয়ে যেতে পথ পাবে না।

এই ছিল তখনকার দিনের চল্‌তি বিধান!

আমার শৈশব-রঙ্গমঞ্চের পট যখন প্রথম উত্তোলিত হল—দেখা গেল কয়েকটি মানুষ আমাকে একান্ত ভাবে নিবিড় করে ঘিরে বসে আছে। তাদের চোখের আয়নায় পড়েছে আমার মুখের ছায়া, তাদের বাদ দিয়ে শিশুকালকে যেন কিছুতেই ভাবতে পারিনে। আমার ছেলেবেলাকার কোন ছবিই তাদের ছেড়ে দিয়ে আঁকা হয় নি। রবার ঘসে যে তাদের ছবি আমার শৈশবের খাতা থেকে বাদ দিয়ে দেবো সে সাধ্যি আমার নাই! তাদের যদি বাদ দিই ত' আমিও মুছে যাই!

তখনকার দিনে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় বিয়ে হত। আমার নিজের বাড়ী পূব পাড়ায় আর মামাবাড়ী পশ্চিম পাড়ায়।

আমি কিন্তু জন্মেছি মামাবাড়ীতে, মানুষ হয়েছি মামাবাড়ীতে, বস্তুত আমার ছেলেবেলাকার যা কিছু গল্প সব ওই মামাবাড়ীকে কেন্দ্র করেই।

আমি যখন খুব ছোট তখন বাবা মারা যান, কিন্তু মামাবাড়ীর অতি আদরে বাবার অভাব কোনো কালেই বুঝতে পারি নি।

আমরা দুই ভাই। দাদা আমার চাইতে তিন চার বছরের বড়ো। বাবার নাম দীনবন্ধু। দুই ভাই রাখালবন্ধু আর অখিলবন্ধু।

ছেলেবেলায় সব চাইতে বেশী আদর যার কাছ থেকে পেয়েছি—তিনি হচ্ছেন আমার দিদিমা। আমাদের দুটি ভাইকে তিনি যেন ডানার আড়ালে অতি সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখতে চাইতেন। তাঁর জীবনের সমস্ত দুঃখ-বেদনা দুই ফোঁটা চোখের জল হয়ে ঝরে পড়ে আমরা দুটি ভাই যেন দুটি হাল্‌কা ফুল হয়ে তাঁর বুকে ফুটে উঠেছিলাম। পাছে সেই ফুল দুটির দল অকালে ঝরে যায় তাই তাঁর আশঙ্কার সীমা ছিল না! সেই জন্যে অতি বেশী আদর পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে।

আমাদের দেশের দিদিমারা সাধারণত নাতিদের একটু বেশী আদরে-আবদারে রাখেন, কিন্তু আমাদের দুটি ভাইয়ের ক্ষেত্রে সেই স্নেহ একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল,—পাত্র ছাপিয়ে উপছে পড়েছিল বললেও বেশী করে বাড়িয়ে বলা হয় না!

আজও যেন চোখের ওপর ভাসছে দিদিমার পাতলা ছিপ্‌ছিপে দীর্ঘ দেহটি। একাদশীর পারণের পর কাঁচা মুগ-ভেজা, সাবুদানা-মাখা নারকেল কোরা, ছানা, ঘরের তৈরী সন্দেশ নিয়ে আমায় পেছু ডাক্‌ছেন আর আমি খেলার নেশায় পালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি, ছুটোছুটি করছি—কিছুতেই তাঁকে ধরা দিতে চাইছি নে!

আমার মা দিদিমার একমাত্র মেয়ে আর মামা একমাত্র ছেলে। এঁদের দু'জনকে নিয়েই তাঁর সংসার। মেয়ের অকাল বৈধব্যে দিদিমা সারাটা জীবন অতি মনমরা হয়ে দুঃখে কাটিয়েছেন। অথচ তখনকার দিনে মামাবাড়ী ও আমাদের বাড়ীর অবস্থা খুবই ভালো ছিল। ভালো পাত্র আর ভালো সম্পত্তি দেখেই দিদিমার আগ্রহেই এ বিয়ে নাকি হয়েছিল। কিন্তু তার এই করুণ আর অশ্রু-সজল পরিণতিতে দিদিমার দুঃখের সীমা ছিল না!

দুটি পাড়া নিয়ে আমাদের গ্রাম।

পূব পাড়া আর পশ্চিম পাড়া।

পূব পাড়ায় আমাদের বাড়ী—মুন্সীবাড়ী বললে সবাই চেনে।

এককালে নাকি সমারোহ আর ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। গ্রাম দেশে আজও প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মুন্সীবাড়ীর টাকায় ছ্যাত্‌লা পড়ে যায় বলে—ছাদে রদ্দুরে শুকোতে দেয়া হত। এখনো লোকে বিশ্বাস করে মুন্সীবাড়ীতে কোথায়ও না কোথায় গুপ্তধন লুকানো আছে। বড় হয়ে দাদাকে দেখেছি এখানে-ওখানে-সেখানে সেই গুপ্তধনের জন্যে দেয়াল খুঁড়তে।—

কাশীধামের মুন্সীঘাট নাকি আমাদের পূর্ব্বপুরুষরাই নির্ম্মাণ করে-ছিলেন এ কথাও শুনেছি। ঢাকা সহরে আমাদের বারোয়ারী গৃহ এখনো অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে আছে।

যাক্ সে সব কথা। এখন ছেলেবেলার কথাই বলি।

আমরা যখন খুব ছোট তখন দেখেছি—মুন্সীবাড়ীতে বাঁধা ষ্টেজ! গ্রামের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ প্রায়ই সেখানে থিয়েটার করতেন। এ ছাড়া যাত্রা, সার্কাস, অনেক কিছু হত।

এদিকে ছোটদের লোভ ছিল দুর্নিবার। কিন্তু আমাদের মামা-বাড়ী ছিল অতি রক্ষণশীল পরিবার। সেই জন্যে আমরা ছেলেবেলায় এই সব আমোদ-প্রমোদ দেখতে অনুমতি পেতাম না।

দাদামশাইকে যদিও আমরা দেখি নি তবু বড় হয়ে জানতে পেরেছি যে তিনি কেশব সেন, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ মণীষীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। যদিও ব্রাহ্মধর্ম্মে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন নি, তবু সমাজ-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পরিকল্পনা নিয়ে সারা জীবন তিনি গ্রামে বাস করে গেছেন। তখনকার দিনে ওই অজ পাড়াগাঁয়ে থেকেই তিনি রীতিমত ডায়েরী লিখতেন। বড় হয়ে সেই ডায়েরী পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমার জন্মের সন তারিখ জান্‌তে পেরেছি দাদামশায়ের এই ডায়েরী থেকে। তখনকার দিনে গ্রাম দেশে আনন্দনাথ সেনের নাম করলে—লোকে সত্যের অবতার বলেই জান্‌তো। এই দাদামশায়ের একমাত্র ছেলে—শ্রীযদুনাথ সেন আমার মামা বড় হয়ে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন কল্‌কাতার স্বর্গত শ্যামাদাস বাচস্পতির কাছ থেকে।

এইটুকু বেশ মনে আছে—ছেলেবেলায় দিদিমা কিছুতেই আমাদের নিজেদের বাড়ীতে যেতে দিতেন না—পাছে আমরা থিয়েটার দেখে আর যাত্রা শুনে বখে যাই। সেই প্রলোভনকে যাতে আমরা জয় করতে পারি সেজন্যে দিদিমার আদরের মাত্রা কেবলি বেড়ে যেত। উদারা থেকে মুদারা—মুদারা থেকে তারায় গিয়ে পৌঁছুতো। তবু এক পাড়ায় যাত্রার ঢোল বাজলে কিম্বা থিয়েটারের কনসার্ট সুরু হলে আর এক পাড়ায় গিয়ে তার রেশ পৌঁছুতো। শিশু-মন উন্মুখ হয়ে থাক্‌তো অজানাকে জান্‌বার জন্যে—অচেনাকে দেখবার জন্যে। কী সে বস্তু—যা পাড়ার সব ছেলেমেয়ে দু'চোখ ভরে দেখতে পাচ্ছে কিন্তু আমাদের পক্ষে তা একেবারে যবনিকার আড়ালে ঢাকা।

দিদিমা আমাকে উস্‌খুস্‌ করতে দেখলেই ছড়া কাটতেন—

"খায় দায় পাখিটি
বনের দিকে আঁখিটি !"

আমি মনে-মনে অনেক সময় দুটি বস্তুকে একসঙ্গে মিশিয়ে উপভোগ করবার চেষ্টা করতাম। সত্যি, মামাবাড়ীর আদর আর বাড়ীর আনন্দ —এই দুটিকে যদি একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলা চলত ত' না জানি কি মজার ব্যাপারই হত !

যাদের কোলে কোলে আমি মানুষ হয়েছি—তার ভেতর মা সব চাইতে কম কথা কইত।

সকলের বেশী আবদার আর জুলুম যার ওপর আমার চল্‌ত তার নাম হচ্ছে দাদি মাসি। মায়ের বোন মাসি নয়, বাড়ীর ঝি। পুকুরের পাড়ে তার ঘর। কিন্তু হলে হবে কি—তখনকার দিনে এই নিয়ম ছিল যে, ঝি-চাকরদের মাসি-পিশি-মামা-খুড়ো বলে ডাকা হত। যে ঝি ঘরের কাজ করত—তাকে বলা হত—"ঘরের কাম-করণী", আর যে বাইরের কাজ করত, এঁটোশালা থেকে নিয়ে বাসন মাজত—তাকে বলা হত—"বাইরের কাম-করণী"। কিন্তু আমরা তাকে জানতাম—দাদি মাসি আর হরি পিশি বলে। ছেলেবেলায় কোনো দিন এতটুকু মনে হয়নি যে, তারা আমাদের সত্যিকারের মাসি-পিশি নয়। এমনি ছিল তখনকার দিনের সমাজ-ব্যবস্থা।

আত্মারাম ঠাকুরের কথাই কি ভুল্‌তে পারি ?

উড়িষ্যা দেশের পাচক ব্রাহ্মণ, কিন্তু বাঙলা দেশের এই গণ্ডগ্রামে বাস করে একেবারে বাঙালী হয়ে গিয়েছিল। মামাবাড়ীর রান্না-ঘরের সমস্ত দায়িত্ব ছিল এই আত্মারাম ঠাকুরের ওপর। জীবনে বহু দেশে বহু রান্না খেয়েছি, কিন্তু আত্মারাম ঠাকুরের হাতের 'পাতুরী' যে খেয়েছে—কোনো দিনই তার স্বাদ সে ভুল্‌তে পারবে না।

সন্ধ্যে হলেই আমার দু'চোখ ঘুমে ঢুলে আস্‌ত—তখন দিদিমা আমাকে পাঠিয়ে দিতেন রান্নাঘরে—এই আত্মারাম ঠাকুরের কাছে। এত মজাদার, আর অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্প বল্‌তে পারত এই আত্মারাম

ঠাকুর যে ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না! লম্বা কালো কুচকুচে মানুষটি, ছোট ছোট করে·চুল ছাঁটা—সেই চুলের মধ্যে আবার একটু কোঁকড়া ভাব! ক্রমাগত বৈটে থেকে পান খাচ্ছে—আর অনর্গল গল্প বলে যাচ্ছে। তখনকার দিনে খুব বড় বড় কাটের পিঁড়ি থাক্‌তো রান্নাঘরে। সাধারণতঃ কাঁটাল কাঠ দিয়ে তৈরী হত এই পিঁড়ি। এই রকম একটা বিরাট পিঁড়ির ওপর আত্মারাম ঠাকুর আমায় বসিয়ে দিত। আমার শরীরের তুলনায় পিঁড়িটির আকার এত বড় যে গুটিসুটি মেরে দিব্যি তার ওপর শুয়ে থাকা যায়।

কাঠের লম্বা একটা পিলসুজ—তাকে বলা হত গাছা। এই গাছার ওপর থাকত একটি কুপি। আত্মারাম ঠাকুর আমায় গল্প বলত আর ছুটে ছুটে গিয়ে ডালে ফোঁড়ন দিত, কিম্বা কড়াই থেকে তরকারী নামাতো অথবা ভাতের মাড় গাল্‌ত। তার এই ছুটোছুটির সময় গাছার ওপরকার কুপির আলোতে বাঁশের বেড়ার ওপর তার নানা রকম ছায়া পড়ত—আমার মনে হত একটা রাক্ষস কিম্বা দানব যেন রাজপুত্রের খোঁজ পেয়ে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু তাই বলে আত্মারাম ঠাকুরকে আমায় আদপেই ভয় করত না। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় নানা গল্পের এই কথকটিকে না পেলে আমার মনটা উস্‌খুস্‌ করে উঠত।

আত্মারামের গল্পের ভাণ্ডারও ছিল অফুরন্ত।

বাঘের গল্প, শেয়ালের গল্প, চোরের গল্প, রাজপুত্র-রাজকন্যা-তেপান্তরের মাঠের গল্প, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প···আদ্যিকালের বৈদ্যি-বুড়ির গল্প···বলে যেন আর শেষ করা যায় না।

আত্মারাম ঠাকুরকে কোনো দিন বলতে শুনি নি—আজ আর কোন গল্প মনে পড়ছে না! গ্রামোফোনে দম দিয়ে রেকর্ডের পর রেকর্ড চাপিয়ে দিয়েই যেমন খেয়াল-খুশী মতো গান শোনা যায়—আমাদের আত্মারাম ঠাকুর ছিল তেমনি। সন্ধ্যেবেলা গল্পের কথা বলবার যেটুকু অপেক্ষা! আর সত্যি কথা বলতে কি—গল্প বলে প্রচুর আনন্দ পেতো এই মানুষটি! গল্প যে বলে—আর গল্প যে

শোনে—দুটি মানুষই যখন তৃপ্ত হয় তখনি হয় কাহিনী বলা সার্থক।

এই আত্মারাম ঠাকুরই বোধ করি সঙ্গোপনে আমার মনে গল্পের বীজ বপন করে দিয়েছিল। সেই কথা অনেক সময় বসে ভাবি। এত ভালো রান্না আর এমন সুন্দর গল্প বলার এই রকম অদ্ভুত মিল আমার চোখে সচরাচর আর পড়ে নি।

খাট্‌তেও পারত এই আত্মারাম একেবারে দানবের মতো। যজ্ঞি-বাড়ীর কাজে সে একাই একশ! মামাবাড়ীতে যখন বিরাট বিরাট নেমন্তন্নের আসর বস্‌তো—দেখেছি আত্মারাম ঠাকুর একা কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে পারত! এই প্রকাণ্ড পোলাও-এর হাঁড়ি নাড়ছে, এই ছুটোছুটি করে আর দশটা বামুন-ঠাকুরকে খাটাচ্ছে—আবার পর মুহূর্ত্তেই ছুটে গিয়ে কি রকম আকারের মাছ কুটতে হবে তার নির্দ্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু এই দানবীয় পরিশ্রমের আগের দিন রাত্তিরে চাই গাঁজার পয়সা। নইলে তাকে দিয়ে কাজ করানো এক রকম অসম্ভব ছিল।

এই উৎকলের আত্মারাম ঠাকুর আমার ছেলেবেলাকার অনেকখানি যায়গা জুড়ে আছে। ঠাকুর আমাকে ভালবাসতোও খুব। কত যে কোলে-পিঠে উঠেছি, চুল ধরে টেনেছি,—না খাওয়ার জন্যে বায়না করেছি, সে কথা এখন বসে ভাবতে ভারী মজা লাগে!

আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা খাওয়ার জন্যে কান্নাকাটি করে, আবদার করে—আর আমি বায়না ধরতাম না-খাওয়ার জন্যে। এক-দিকে দিদিমার আদর, আর একদিকে আত্মারাম ঠাকুরের সতর্ক দৃষ্টি! এড়িয়ে যাবার যো কি ছিল?

আর যে একটি মানুষের কাঁধে চেপে আমি এখানে-ওখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতাম তার নাম কুইনামামা। মামার কোনো সম্পর্কিত ভাই নয়—আমাদের মামাবাড়ীর সরকারী বাজার সরকার। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের মতো বেশ খানিকটা ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি-গোঁপ ছিল—আর সবাইকার মন জুগিয়ে চল্‌বার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল এই কুইনামামার।

মামাবাড়ীর ছিল তিনটে হিস্সে—বড় তরফ, ছোট তরফ আর মেজ তরফ। এই মেজ তরফ হচ্ছে আমার মামাবাড়ী। কিন্তু এই কুইনামামা না হলে তিন তরফের কারো এক মুহূর্ত্ত চল্‌তো না। বিশেষ করে বাড়ীর গিন্নিরা এই কুইনামামাকে মনে করতেন অন্ধের নড়ির মতো। কার তরফে জামাই এসেছে পছন্দমত মাছ আন্‌তে হবে, কোন হিস্যায় পূজোর পালা—বেশী দুধ চাই, কোন্ বাড়ীর ছেলেপুলের কান্না থামাতে চাই কদমা আর ফেনী বাতাসা—সব কুইনার ওপর ভার। অনেকখানি যায়গা জুড়ে তিনটি তরফ···আর এই বাড়ীর বিভিন্ন সীমানা জুড়ে তিনটি পুকুর। সেই পুকুরে প্রচুর মাছ। তিনটি তরফে যেমন যেমন ঘুরে ঘুরে পূজোর পালা আস্‌ত—তেমনি কুইনা-মামার খাওয়াও চল্‌তো পালা হিসেবে এই তিন তরফে। আজও যেন চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি—কুইনামামা রান্নাঘরে খেতে বসেছে—আর আমি আচমকা পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাত দিয়ে গলা চেপে ধরেছি! বেচারী খেতে পারছে না—তবু আমাকে একটি কড়া কথা বল্‌ছে না, কিম্বা জোর করে পিঠের ওপর থেকে সরিয়ে দিচ্ছে না।

আমি তখন খুব ছোট।

হঠাৎ সারা গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেল—দেশের রাজা আস্‌ছে।

ব্যাপার হচ্ছে এই যে—জাতীয় নেতা সুরেন ব্যানার্জ্জি টাঙ্গাইল শহরে যাচ্ছেন কি একটা রাজনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষে। আমাদের গ্রামের ভেতর দিয়েই যাবার রাস্তা। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সেই সড়ক দিয়ে যাবেন সুরেন ব্যানার্জ্জি। আশে-পাশের অনেকগুলি গ্রাম থেকে লোক একেবারে ভেঙে পড়েছে।

তারা আর কিছু বোঝে না, শুধু দেশের রাজা দেখার কামনা। অত লোক এক সঙ্গে ত' এর আগে দেখিনি। তাই ভারী ভয় পেয়ে গেলাম। কুইনামামা বললে, ভয় কি? আমার কাঁধে চাপিয়ে তোমায় দেশের রাজাকে দেখাই।

তাই হল।

একটি পুকুরের পাড়ে বেশ উঁচু যায়গায় দাঁড়িয়ে কুইনামামা আমাকে তার কাঁধের ওপর তুলে নিলে। শুধু রাশি রাশি নরমুণ্ড।

কে যে দেশের রাজা তা কি আর ঠাহর করা গেল ?

আমি শুধোলাম, হ্যাঁ কুইনামামা, রাজার মাথায় মুকুট কৈ ? মুকুট ত' দেখতে পেলাম না !

হেসে কুইনামামা উত্তর দিলে, এ রাজার মুকুট থাকে না। দেশের লোকের রাজা কি না তাই দেশের লোকের মতই। আমার মতো দাড়ি দেখেছ ত ?

অত দূর থেকে দাড়ি যে দেখেছি তাও মনে পড়ল না।

এই সময় গ্রামে খুব স্বদেশীর ধূম পড়ে গিয়েছিল—আবছা-আবছা মনে আছে। গ্রামের যুবকদল একটি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছিল—সেখানে সবাই এক ওস্তাদের কাছে লাঠি খেলা শিখতো। মামাও প্রতিদিন বিকেলে এইখানে যেতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলার ঘটনা বেশ মনে আছে। মামা ঘেমে-চুমে লাঠি খেলা শিখে বাড়ী ফিরেছেন। উঠোনে দাঁড়িয়ে বোঁ-বোঁ করে লাঠি ঘুরিয়ে আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তখন কতটুকুই বা বয়েস—কিন্তু ঘটনাটা মনে একেবারে ছাপ দিয়ে দিয়েছিল। সবাই মিলে এই রকম লাঠি চালিয়ে নাকি ইংরেজ তাড়াবে এই রকম কথাও বড়দের মুখে শুনেছিলাম।

গ্রামের যুবক সম্প্রদায় একজোট হয়ে স্বদেশী কাপড়ের দোকান দিয়েছিল। তাতে তাঁতের ধুতি, জোলাদের বোনা গামছা নাকি পাওয়া যেত। এ ছাড়া লাঠি খেলার আখড়া ত' পুরোদমেই চল্‌ছিল।

প্রথম যেদিন যাত্রা দেখেছিলাম তার কথাও বেশ মনে করতে পারি। আমাদেরই গ্রামে পূর্ণ সেন মশায়ের বাড়ী যাত্রা হচ্ছে। পালার নাম—কংসবধ। আমাদের মুন্সী-বাড়ীতে এক ব্রাহ্মণ নায়েব ছিলেন—আমাদের ছেলেবেলায়। তাঁকে আমরা ঠাকুর্দ্দা বলে ডাক্‌তাম। অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার মনে এই ধারণা ছিল যে, উনি আমার নিজের ঠাকুর্দ্দা। যে দিন আমার ভুলটা একজন ভাঙিয়ে

দিলে সে দিন আমার কি দুঃখ। রাগে আর মনো-বেদনায় আমি কেঁদেই ফেলেছিলাম।

যাক্—যাত্রার গল্পটা আগে শেষ করে নি।

তখনকার দিনে গ্রামে লোক গিস্-গিস্ করত। প্রত্যেকটি বাড়ীতে এত মানুষ থাক্‌ত যে অন্য বাড়ীর লোক নেমন্তন্ন কর্‌তে ভয় পেতো।

কোনো-না-কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে যাত্রাগান, পাঁচালী, কবিগান ইত্যাদি হত।

তেমনি কোনো একটা উপলক্ষে পূর্ণ বাবুর বাড়ীতে যাত্রাগান হচ্ছে। আমি সেই ঠাকুর্দ্দার কোলে চেপে মহা আনন্দে যাত্রা শুন্‌ছি। কানাই আর বলাই দুটি ছেলে যা চমৎকার সেজেছে! কালো কোঁক্‌ড়ানো চুল, কেমন ঝকমকে পোষাক, কথায়-কথায় গান গাইছে! যত দেখি চোখ যেন আর কিছুতেই ফেরাতে পারি নে!

কংস যখন এসে আসরে হাজির হল—তখন থেকে ভয় ঢুক্‌লো মনে। সাংঘাতিক চেহারা, ভাঁটার মতো লাল দুটি চোখ কেবলি ঘোরাচ্ছে। হুঙ্কার দিয়ে সারা আসরটাকে যেন চষে ফেল্‌ছে! কানাই-বলাইর মতো এমন দুটি সুন্দর ছেলের ওপর ওর যে কেন এত রাগ তাও ভালো করে বুঝতে পারলাম না।

সেই কানাই-বলাই এলো মথুরায়—কংসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। গুম্-গুম্ করে যুদ্ধের বাদ্যি বেজে উঠল। কংস চোখ-মুখ লাল করে আসরে এসে নাম্‌লো। তারপর বুনো মোষের মতো একেবারে এধার থেকে ওধার—ওধার থেকে সেধার ফোঁস-ফোঁস করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। যাকে ধরবে—যেন একেবারে আস্তো চিবিয়ে খাবে এমনি মার মূর্ত্তি! ওই পুঁচকে দুটো ছেলে কানাই-বলাই···তাদের বুঝি একদম পিশে মেরে ফেলবে। কংস কানাই-বলাইএর দিকে আচম্‌কা ভাবে রাক্ষসের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

ঠাকুর্দ্দা আমাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চিকের আড়ালে আমার মা বসে যাত্রা শুনছিলেন সেইখানে আমায় পৌছে দেবেন—

এই তাঁর ইচ্ছে। কোলে চেপে যেতে যেতে এক লহমায় পেছন ফিরে দেখে নিলাম যে কানাই-বলাই কংসের চুলের ঝুঁটি ধরে ফেলেছে।

কিন্তু আমার কান্না আর কিছুতেই থামে না! মায়ের কোলে বসেও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিলাম—বেশ মনে আছে।

ছেলেবেলায় আমি খুব স্বপ্ন দেখতাম। অবশ্য সব ছেলেমেয়েই ছোটবেলায় সব আজগুবি স্বপ্ন দেখে থাকে। এক-এক দিন দেখতাম একটা বিরাট বাঘ আমাকে তাড়া করেছে। প্রাণপণে আমি ছুটছি। যতই এগুতে যাচ্ছি—কিছুতেই এক পা এগুতে পাচ্ছি না। পায়ে-পায়ে যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। বাঘ আর আমার ভেতরকার দূরত্ব আস্তে আস্তে কমে আসছে। হয়ত আমি আর চলতে না পেরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। আচম্‌কা ঘুম ভেঙে গেল।

জেগে দেখি ঘামে বিছানা একেবারে ভিজে গেছে! বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তেজনায় জেগে থাকতাম। চোখের পাতায় আর কিছুতেই ঘুম আসতে চাইত না! আর একদিন হয়তো স্বপ্ন দেখতাম—একটা একানোড়ে ভূত আমাকে তুলে নিয়ে একেবারে তাল গাছের মাথায় গিয়ে চড়েছে। নীচের দিকে তাকালে মাথা একেবারে ঘুরে যায়। হঠাৎ পা ফস্‌কে সেই তালগাছের মাথা থেকে পড়ে গেলাম—! সোঁ সোঁ করে নীচের দিকে নেমে আসছি! চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে···নামছি···নামছি···আরো নেমে যাচ্ছি! এক্ষুনি মাটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গুঁড়িয়ে যাবো। আচম্‌কা ঘুম ভাঙতে দেখি—খাটের থেকে পড়ে গেছি! ঐ তাল গাছের একানোড়ে ভূতকে খুব ভয় করতাম আমি। তাই সন্ধ্যে বেলায় তাল গাছের গোড়া দিয়ে যাবার সময় গা ছম্‌ছম্‌ করতো।

আবার মজার মজার স্বপ্নও যে না দেখতাম তা নয়। স্বপ্ন দেখতাম, কোন বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গেছি—। কত রকম খাবারের আয়োজন হয়েছে। থরে থরে সাজিয়ে দিয়েছে বাটিতে করে আমার চার দিকে। কিন্তু কি বিপদ! কিছুতেই খেয়ে শেষ করতে পারছি না। যত খাচ্ছি—পেটে ক্ষিদে থেকে যাচ্ছে।

এই সময় যদি ঘুম ভেঙে যেতো—তবে মনে-মনে দুঃখ থাকত—হায় হায়! এত খাবার হাতের সামনে পেয়েও শেষ করতে পারলাম না। ভারী একটা আপশোষ হত!

এক-এক দিন গভীর রাত্তিরে ঘুম ভেঙে যেতো। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে শুন্‌তে পেতাম—'ভূত-ভুতুম' পাখী ডাকছে! ভয়ে শরীর কাঠ হয়ে যেতো। বিছানায় পাশ ফেরবার ভরসা পর্য্যন্ত হত না।

পাশে মা শুয়ে আছে—তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকবার পর্য্যন্ত সাহস নেই! তারপর ওই অবস্থায় কখন যে আবার ঘুমিয়ে পড়তাম···জানতেও পারতাম না।

ছেলেবেলায় অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্নের কথা—বড় হয়েও ভুলতে পারিনি! এই বয়সেও হঠাৎ এক-এক দিন এমন স্বপ্ন দেখে বসি যে মনে হয়—এই স্বপ্ন ত' আমার চেনা। খুব ছোটবেলায় যেন এর সঙ্গে পরিচয় ছিল! তখন ভারী মজা লাগে।

বহু স্বপ্নের ব্যাপার নিয়ে আমি ছোটদের জন্যে গল্পও লিখেছি। তাতে অবশ্য স্বপ্ন আর গল্প মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

আমাদের গাঁয়ে বহুরূপী আসতো—নানা রকমের সাজ দিয়ে। আজ-কাল বহুরূপীদের বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না! এই শিল্পীর দল আমাদের সামাজিক জীবন থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে।

বহুরূপী আসতো সাধু-সন্ন্যাসী সেজে—কখনো বাঘ-ভাকল্লুক সেজে, আবার কখনো বউ সেজে। গাঁয়ের লোকদের কাছ থেকে কলাটা-মূলোটা, চাল, পয়সা বেশ পেতো। কোনো কোনো বাড়ী থেকে নতুন আর পুরোনো ধুতিও আদায় করে নিতো।

বহুরূপী সাধারণতঃ আসতো সন্ধ্যেবেলায়। আচম্‌কা সবাইকে অবাক করে দেবে—এই থাক্‌তো মতলব।

বহুরূপীর রকমারি সাজ-পোষাক দেখবার জন্যে আমাদের গাঁয়ের ছেলে-বুড়োর উৎসাহের অবধি থাকত না। কবে বহুরূপী কি রকম সাজ দিয়ে আসবে তাই নিয়ে সকলের মধ্যে বাজি অবধি রাখা হত। কেউ কেউ আবার ফরমাস করতো—বহুরূপী ভাই, এই সেজে আসতে

হবে। কেউ বলতো গণৎকার, কেউ বলতো মা দুর্গা, কেউ বা মা লক্ষ্মী—কেউ বা ছিন্নমস্তা। বহুরূপী ত' সকলের অনুরোধ রাখতে পারত না। আর তা ছাড়া সব রকম সাজ-পোষাক তার ঝোলাতে থাকতও না। তবু সে গাঁয়ের লোকদের খুশী করবার প্রাণপণ চেষ্টা করত।

আমার মামী কলকাতার মেয়ে।

আসলে ঢাকায় বাড়ী হলে কি হবে—কলকাতায়ই তিনি মানুষ হয়েছেন। খুব ফর্সা—তাই গ্রাম-দেশে মেম সাহেব বলে তাঁর একটা খ্যাতি ছিল। আমার ছেলেবেলায় এই মামী ছিলেন আমার খেলার সাথী। তাঁর কাছ থেকে প্রচুর গল্প শুনেছি। আদর আর যত্ন পেয়েছি এত যে তার লেখা-জোখা নেই। তখনো ত' তাঁর ছেলে-পুলে কিচ্ছু হয়নি। তাই যত স্নেহ-ভালবাসা আর আদর সব আমাদের দুটি ভাইকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। এই মামীর কাছেও আমি অনেক ভূতের গল্প শুন্‌তাম। সন্ধ্যে হলেই তাঁকে আঁক্‌ড়ে ধরতাম—নতুন নতুন ভূতের গল্পের জন্যে। মামীর গল্প বলার একটি নিজস্ব ধরণ ছিল। তার ফলে তিনি বেশ রসিয়ে গল্প বল্‌তেন—আর অতি সহজেই সে গল্প জমে যেত। ভূতের গল্প শুন্‌তে যেমন ভয় করত—তেমনি আবার ভালোও লাগত। ঠিক যেন ঝাল-ছোলা অথবা ঝাল-চাট্‌নী খাওয়ার মতো। চোখ দিয়ে জল বেরুবে লঙ্কার ঝাঁজে—তবু জিব বল্‌বে, আরো একটু চেখে দেখি!

ভূতের গল্প এমনি মজার জিনিস!

এই ভূতের গল্প শোনার ব্যাপারে একটি লণ্ঠন কিন্তু পরিবেশ সৃষ্টিতে ভারী সাহায্য করত।

লণ্ঠনটার তেল যখন কমে আস্‌ত—সেটা কেবলি দপ্‌-দপ্‌ করতে থাক্‌ত। তার ফলে বেশ একটা ভূতুড়ে আবাহাওয়ার সৃষ্টি হত। তখন ত আর তেল কমার ব্যাপার জান্‌তে পারতাম না। মনে করতাম—ভূতুড়ে কাণ্ডই এই রকম। দপ্‌-দপ্‌ করতে করতে লণ্ঠনটা সত্যি এক সময় নিভে যেত!

ঘর একেবারে অন্ধকার !

তখন মামী নাকি সুরে বল্‌তেন—হাঁউ—মাঁউ—কাঁউ—

আর আমি ভয় পেয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরতাম। কিন্তু আবার পরদিন ভূতুড়ে গল্প শোনা চাই।

একটা বিষয় আমি বেশ লক্ষ্য করেছি যে, ছেলেবেলায় ভূতের গল্প প্রচুর শুনেছি বলেই ভূতের ভয়টা আমার কম। আর সেই জন্যেই হয়ত ছোটদের জন্যে রসিয়ে ভূতুড়ে কাণ্ড লিখতে পারি।

ভূতকে জয় করতে না পারলে ভালো ভূতের গল্প লেখা যায় না।

হরি পিশিকে বেশ মনে পড়ে। হরি পিশি মামাবাড়ীর বাসন-মাজার ঝি। ছোট-খাটো মানুষটি। কদম ফুলের মতো কাঁচা-পাকা চুল ছাঁটা। বর্ষাকালে গ্রামের খাল-বিল-পুকুর সব জলে ডুবে যেতো। অনেক বেলা পর্য্যন্ত বাসন মেজে হরি পিশি ভাত নিয়ে বাড়ী যেত। হেঁটে যাবার ত' তখন উপায় ছিল না। কেউ ঘাটের নৌকো করে তাকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ত। একটা বড় মানকচুর পাতা দিয়ে হরি পিশি তার ভাত ঢেকে নিত! তারপর নৌকায় করে চলে যেত নিজের বাড়ীতে। এই ছবিটাই মনের মধ্যে আঁকা হয়ে আছে।

হরি পিশি বাড়ী থেকে আসবার মুখে নানারকম পাকা ফল আমার জন্যে লুকিয়ে নিয়ে আসত। যে দিনের যে ফল সেটা সংগ্রহ করবার একটা চমৎকার যোগ্যতা ছিল হরি পিশির। আমি ছেলেবেলায় হরি পিশিকে নিজের পিশি বলেই মনে করতাম। সে যে আমাদের ঝি এবং বাইরের লোক, সে কথা আদপেই মনে জাগত না।

হরি পিশি খুব কম কথা বলত—কিন্তু তার মনে স্নেহের একটা ফল্গুধারা লুকানো ছিল—যা' আজকের দিনের ঝি'দের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের সমাজ-জীবনে মনিব আর ঝি-চাকরের সম্পর্কটা এখন একেবারে টাকা-আনা-পাইয়ের মধ্যে চলে গিয়েছে। স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার ভাবটা একেবারে বাস্প হয়ে আকাশে উড়ে গেছে!

আর মনে পড়ে—আমাদের ভুইঞা মশাইকে। মোটা-সোটা, লম্বা-চওড়া, গোল-গাল মানুষটি। ভুইঞা মশাই প্রচুর খেতে পারতেন।

ইনি মামাবাড়ীর একজন নায়েব ছিলেন। এক জামবাটি-ভর্তি ক্ষীর—পূরো একটা কাঁটাল গুলে ইনি অবলীলাক্রমে খেয়ে ফেলতেন! এঁর খাওয়াটা সেই সময় মামাবাড়ীতে একটা গল্পকথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

ভূইঞা মশায়ের জ্বর হলেও বিপদের কারণ ছিল। বড় বড় পাথরের বাটি—তার নাম খাদা! সেই এক খাদা ভর্তি তুধ-সাবু দিয়ে তিনি পথ্যি করতেন। ভূইঞা মশায়ের জ্বর হলে আমাদের দাদিমাসি গজ-গজ করত, হুঁ! এইবার এক খাদা তুধ-সাবুর ব্যবস্থা করো—ভূইঞা মশায়ের জ্বর হয়েছে!

ভালো অবস্থাতেই হোক—আর অসুখই করুক—মানুষটির খোরাক কখনো কমত না—এইটিই ছিল দেখবার জিনিস। মানুষটির বেশ কতকগুলো মুদ্রা-দোষ ছিল। একটু ছুঁৎমার্গের ভয় ছিল যেন তার। শুধু তাই নয়—যখন তিনি পথ চল্‌ছেন—কেবলি পথের তু'ধারে—থু—থু থু—থু করতে করতে অগ্রসর হতেন! যেন তিনি একাই খাঁটি পবিত্র মানুষ আর জগতের সব-কিছুই অশুচি। সবাইকার কাছ থেকেই তিনি একটু আলাদা থাকবার চেষ্টা করতেন।

মামাবাড়ীতে যে তিনটি তরফ ছিল—সেই তিনটি তরফের কর্ত্তা ছিলেন তিন জন। বড় তরফের কর্ত্তা ছিলেন বড় মামা—মামার জ্যাঠতুতো ভাই—কৃষ্ণনাথ সেন। তিনি নিজে কবিতা ও প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করতেন। তাঁর সাহিত্য প্রীতি সে কালে সে অঞ্চলে সর্ব্বজনবিদিত ছিল। ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেন মশাই সেই সময় আমাদের পাশের গ্রাম সন্তোষে থাক্‌তেন এবং কবি প্রমথনাথ রায়-চৌধুরীর ছেলের গৃহশিক্ষক ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি বড় মামার আসরে এসে মজলিস জমাতেন। পরবর্ত্তী কালে বড় মামা 'ভারতবর্ষ কাগজেও তাঁর বহু রচনা প্রকাশ করেছেন। সন্তোষ গ্রামে একমাত্র রায়-চৌধুরীর পরিবার ছাড়া আর সাহিত্যচর্চ্চার কোন আস্তানা ছিল না। তাই সার্ব্বজনীন জলধর দা' আমাদের গ্রামে এসে প্রতিদিন সন্ধ্যায়—বড় মামার বৈঠকে সাহিত্যের মজ্‌লিস্ জমিয়ে তুল্‌তেন।

এইখানে আর একটি রসজ্ঞ লোকের দেখা পাওয়া যেত—তাঁর নাম গাঙ্গুলী মশাই। এই গাঙ্গুলী মশাই বললে গাঁয়ের সবাই তাঁকে চিন্‌তো। সে কালে তিনি ওই অজ পাড়াগাঁয়ে বসেই "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় নানা রকম খবর পাঠাতেন এবং প্রবন্ধও লিখতেন। বস্তুতঃ, ওই অঞ্চলের শিক্ষিত-সমাজে তাঁর একটি পৃথক্ মর্য্যাদা ছিল। কিছুকাল তিনি গ্রামের মাইনর স্কুলে শিক্ষকতাও করেছিলেন। ছোটদের যে তিনি ভালোবাসতেন—তার প্রকাশভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ নতুন টেক্‌নিকে। সে সম্পর্কে মজাদার গল্প পরে বলব।

মামাবাড়ীর ছোট তরফের কর্ত্তা—শ্রীকেদারনাথ সেন, আমাদের ছোট দাদামশাই। আমরা ডাকতাম, ছোট আজামশাই বলে। স্নেহে আর আদরে, শাসনে আর শুভেচ্ছায় একেবারে টুইটম্বুর, প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ভর্তি মানুষটি। এঁরই স্নেহচ্ছায়ায় নিজের দাদামশায়ের অভাব জীবনে কখনো বোধ করিনি। আর চিরকাল দেখেছি আমার মাকে তিনি নিজের মেয়েদের চাইতেও ভালবাসতেন। দক্ষিণেশ্বরের মা কালীর যে নাম—আমার মারও সেই নাম। তিনি কখনো পূরো নাম 'ভবতারিণী' উল্লেখ করতেন না,—মাকে 'ভব' বলে ডাকতেন। অতি ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য করেছি, তাঁর শুভ-কামনা আর শুভাশিস্ যেন শতধারে মায়ের শিরে বর্ষিত হত। ছোটদের শাসনের ব্যাপারে তিনি যেমন কড়া ছিলেন—তেমনি ছিলেন আদর দিতে পটু। সারা জীবন ধরেই তাঁর কাছ থেকে আদর পেয়ে আসছি। আমার যে কোন সুনামে তিনি চিরকাল গর্ব্ব অনুভব করেছেন। আজও মনে পড়ে, বড় হয়ে যখন আমার প্রথম রঙীন ছবি মাসিক বসুমতীতে ছাপা হল—তিনি আনন্দের আতিশয্যে সেটা কেটে নিয়ে নিজের শোবার ঘরে বাঁধিয়ে রেখেছিলেন।—যে তাঁর কাছে বেড়াতে যেতো—তাকেই ডেকে দেখাতেন। অনেক সময় আমার নিজেরই লজ্জা করত।

ছোট আজামশাইর তিন বিয়ে। আগের দুই দিদিমাকে আমি দেখিনি! আমি দেখেছি তাঁর তৃতীয়াকে। শুধু দেখিনি, তাঁর স্নেহ

পেয়েছি প্রচুর। আমরা তাঁকে ডাকতাম ছোড়দি বলে। অপূর্ব্ব সুন্দরী ছিলেন তিনি। তাই গরীব ঘরের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও এই জমিদার বংশে তাঁর বিয়ে হওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। দেবী মূর্ত্তির মতো এই ছোড়দির কাছে আমাদের আব্দারের অন্ত ছিল না। নানা রকম খাবার তৈরী করতে পারতেন আমাদের এই ছোড়দি। কত যে ডেকে নিয়ে আমাদের খাওয়াতেন—তা' বলে শেষ করা যায় না। রান্নাতেও তাঁর খুব নাম-ডাক ছিল। আমাদের দেশেব নানা রকম মাছের তুলনা হয় না—আর সে মাছের স্বাদও ছিল চমৎকার। ছোড়দির হাতে সেই মাছ আরো মুখরোচক হয়ে উঠত।

ছোড়দি আমাদের নিয়ে খুব হৈ-হৈ করতে ভালোবাস্তেন। হয়ত আসর খুব জমে উঠেছে—গল্প, হাসি, গান চলেছে পুরোদমে এমন সময় ছোট আজামশাই এসে হাজির। এক কথায় দু কথায় ছোড়দি ছোট আজামশায়ের সঙ্গে মজার মজার কথা বলে ঝগড়া সুরু করে দিতেন। আমরা প্রায়ই ছোড়দির পক্ষ নিতাম—আর 'নারদ' 'নারদ' করে ঝগড়াটাকে ভালো করে পাকিয়ে তুল্তাম। ছোট আজা-মশায়ের দ্বিতীয়া স্ত্রীর মেয়ে আমার সমবয়েসী আর খেলার সাথী। তাকে আমি ডাকতাম ছা'মাসি বলে। এই ছা'মাসির সঙ্গে ছেলে-বেলায় আমার ভারী ভাব ছিল। বড় মামার তৃতীয় ছেলে ছোক্কনও ছিল আমাদের খেলাধূলার সাথী। বড় মামার ছোট মেয়ে মেঘিদিও ছিল আমাদের খেলাঘরের সভ্যা। বয়েসে কিছুটা বড় হলেও সে সাজত আমার খেলাঘরের বৌ। আর ছোক্কনের বৌ সাজতো—ছা'মাসি। খেল্তে খেল্তে এক-একদিন এমন ঝগড়া সুরু হয়ে যেত যে নিজেদের হাতে-গড়া খেলাঘর নিজেরাই ভেঙে ছড়িয়ে তচ্‌নচ্‌ করে দিতাম! এই ঝগড়ার ব্যাপারে ছা'মাসি আমার পক্ষ নিতো—আর ওরা দুই ভাই-বোন কোমর বেঁধে ঝগড়া সুরু করে দিত।

নতুন নতুন খেলনা পাওয়ার জন্যে আমি সব সময় কল্‌কাতার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মামীর মাকে আগে আমরা চোখে দেখিনি

কিন্তু তিনি যে আমাদের আর একটি চমৎকার দিদিমা—সেটা সব সময়ই খেয়াল থাকত। মামী যখন বাপের বাড়ী কল্‌কাতা থেকে আমাদের ওখানে যেতেন—তখন আমাদের দু' ভায়ের জন্যে নানা রকম খেল্‌না নিয়ে যেতেন। এই জাতীয় খেল্‌না গাঁয়ের লোকেরা কেউ চোখেও দেখেনি—তাই এটা ছিল আমার ভারী গর্ব্বের বিষয়। যখন খেলার সাথীদের সঙ্গে ঝগড়া হত—কল্‌কাতার এই সব রকমারী খেল্‌না দেখিয়ে বাজিমাৎ করে ফেল্‌তাম।

এইবার মামাবাড়ীর মেজ তরফের কথা বলি। মেজ তরফের কর্ত্তা হচ্ছেন মামা। তিনি দেশে খুব কম থাক্‌তেন। আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখেছি—তিনি কলকাতায় থাক্‌তেন। সেখানে কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির কাছে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পড়তেন। ছুটি-ছাটাতে এবং মাঝে-মাঝে যখন দেশে আস্‌তেন—আমাদের জন্যে অনেক জিনিস নিয়ে আস্‌তেন। তাই মামার দেশে আসাটা আমাদের কাছে ছিল—পালা-পার্ব্বণের মতো।

আসলে মেজ তরফের কর্ত্রী ছিলেন আমার দিদিমা। তিনিই সংসারটাকে আগ্‌লে রাখতেন—তা ছাড়া গোটা বাড়ীর এজমালী ব্যবস্থা ত' ছিলই। আমার আর এক বিধবা মাসিমা—প্রায়ই আমাদের সঙ্গে থাক্‌তেন। তিনি আমার আপন মাসিমা নন—কিন্তু আপন মাসিমার চাইতেও বোধ করি বেশী ছিলেন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের তিনি নিজের বৌদি। খুব অল্প বয়সে বিধবা হন। এই মাসিমা যেন আমাদেরই আঁক্‌ড়ে ধরে পড়ে ছিলেন। এমন কাজের মেয়ে সে কালে আমাদের গাঁয়ে ছিল না বললেও চলে। খুব তাড়াতাড়ি এমন নিপুণ ভাবে তিনি সব কাজ করতেন যে, কেউ সহজে তাঁর ত্রুটি ধরতে পারত না। আমার মামাবাড়ী যদিও গাঁয়ের পশ্চিম পাড়ায় ছিল—তবু বাড়ীটার নাম কিন্তু ছিল পূব বাড়ী। তার একমাত্র কারণ, এই বাড়ীর পশ্চিমে একটি বিরাট পুকুর ছিল—এবং তার পরেই যে বাড়ীটি তার নাম ছিল পশ্চিম বাড়ী। পশ্চিমের পূবে বলেই বাড়ীটির নাম হয়েছিল পূব বাড়ী। গোটা

গ্রামের লোক তাই পূব বাড়ী বলতে আমার মামাবাড়ীকেই বুঝত।

যে মাসিমার কথা বল্‌ছিলাম—তাঁকে নিয়ে আমার ছেলেবেলায় যে মজার ঘটনাটি ঘটেছিল—এখন সেই গল্পটা বল্‌ছি।

মাসিমা খুব "কম্মা মেয়ে" ছিলেন আগেই বলেছি। প্রায়ই নানা রকম পিঠে-পায়েস করে তিনি আমাদের খাওয়াতেন। এই ব্যাপারে আমার দিদিমার খুব উৎসাহ ছিল—এবং তিনি সুযোগ পেলেই রোজকার বরাদ্দ ছুধ ছাড়াও বাড়তি ছুধ প্রচুর রাখতেন। মাসিমা ত' একদিন খুব খেটে-খুটে আমাদের জন্যে 'পান্তুয়া' তৈরী করলেন। সেই পান্তুয়া হল যেমন নরম তেমনি সুস্বাদু। লোভে পড়ে বেশ কয়েকটা গপাগপ্ খেয়ে ফেললাম। তার ওপর মাসিমা স্নেহের আধিক্যে কেবলি বলতে লাগলেন—আর ছুটো খা—আর ছুটো খা—

এমন লোভ ছাড়া মুস্কিল! খেতে খেতে মাত্রা গেল ছাড়িয়ে। তার ফলে আমার হল অসুখ। ক'দিন ধরে সব খাওয়া-দাওয়া একেবারে বন্ধ—যাকে বলে উপোস। কিন্তু বাড়ীর লোকে ত' তাই বলে পেটে কীল মেরে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে বসে থাকে নি! তাঁদের সবাইকার দক্ষিণ হস্তের কাজ আগের মতোই রসালো ভাবে চলতে থাক্‌লো। কিন্তু আমি কিছু খেতে চাইলেই চার দিক থেকে রব ওঠে—না-না কিচ্ছুটি না। তোর যে অসুখ করেছে!

আর কোনো উপায় না দেখে—এইবার আমি ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লাম। সুর করে কান্না সুরু করে দিলাম—"পান্তুয়া খাওয়ালে কেন?" বেশ মনে আছে এই কান্নার সুর কয়েকটা দিন ধরে চলেছিল! এর পরে কোনো একটা ব্যাপার ঘট্‌লেই বাড়ীর লোকে নাকী সুরে আমায় ঠাট্টা করে বলত—"পান্তুয়া খাওয়ালে কেন—?"

আর মাসিমা ক্ষ্যাপাতেন সব চাইতে বেশী।

আমার প্রথম চুরির কথা মনে হলে এখনো হাসি চেপে রাখা মুস্কিল হয়ে ওঠে। সেই কাহিনীই এখন বল্‌ব—

কে যে বুদ্ধি দিয়েছিল ঠিক মনে নেই। কিন্তু প্ল্যানটা যে অভিনব সে কথা আজও ভুলতে পারিনি।

মাছের একটা পট্‌কা কোনো একটা কৌটোর মধ্যে জল দিয়ে জিইয়ে রাখতে হবে। আর তার ভেতর রেখে দিতে হবে একটি আনি। তাহ'লেই না কি পট্‌কার পেট থেকে বেরুবে একটি মাছ।

একটি ছোট পট্‌কা জোগাড় করা শক্ত নয়। কেন না—মাছেরই দেশ। পুকুরের মাছ—বাজারের মাছ—প্রত্যহ বাড়ীতে প্রচুর মাছ এসে থাকে। ঐ রকম কাণ্ড করলে নাকি সেই পট্‌কার ভেতর থেকে একটি মাছ বেরুবে এবং সেটিকে জ্যান্ত অবস্থায় পুকুরে ছেড়ে দেয়া যাবে।

হরি পিশিকে খোসামোদ করে একটি ছোট মাছের পট্‌কা জোগাড় করা গেল। একটি জার্ম্মাণ সিলভারের কৌটোও ছিল আমার ধন-ভাণ্ডারে। এইবার বিপদ ঘনীভূত হল—একটি আনি সংগ্রহ করার ব্যাপার নিয়ে।

এ বাড়ীতে ছোটদের হাতে পয়সা তুলে দেয়া ছিল একেবারে বারণ। একটি আনি এখন কোথায় পাওয়া যায়? একটি গজমতির মালা জয় করে আনতে বললে না হয় স্বপ্নরাজ্য থেকে আহরণ করা যেত। কিন্তু আনি আমার কাছে সত্যি মহার্ঘ আর দুষ্প্রাপ্য।

এখানে ওখানে সেখানে পয়সা ছড়িয়ে পড়ে থাকে না যে, চট্‌ করে তুলে নেবো। হয়ত দিদিমার মালাজপের থলির মধ্যে মিল্‌তে পারে। কিন্তু সেটা ছোঁয়া একেবারে বারণ। সত্যি, এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! টাকা নয়, মোহর নয়—মাত্র একটি আনি! আর তারই অভাবে পট্‌কা থেকে মাছ বেরুবে না, এই বা কেমন কথা?

দিদিমার কাছে খাবার জিনিস চাইলেই পাওয়া যাবে—কিন্তু পয়সা নয়। বাজার সরকার কুইনা মামার কাছে চাইলে তেড়ে মারতে আস্‌বে। মার কাছে কিম্বা মামীর কাছে চাইবার ত' সাহস নেই! সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার প্রশ্নের বান এসে আমায় কাবু করে ফেলবে!

কি করে পাওয়া যায় তবে সাত রাজার ধন এই মহামূল্য মণিটি?

হঠাৎ দুষ্টু বুদ্ধি জাগল মাথায়। বড় তরফে—বড় মামার বালিশের তলায় খুচরো পয়সা থাকে দেখেছি। সেইখান থেকে একটি আনি নিলে ক্ষতি কি? কেউ জানতেও পারবে না।

সেই ঘরেরই দোতলায় কাঠের মেঝেয় আমাদের 'খেলাঘর' বসে মাঝে মাঝে। বর-বৌ আর আর ঘর-কন্নার খেলা হয় সেই দোতলায় গোপনে। মেঘিদি আমার বৌ সাজে—তাদের ওখানে হামেশা ত' যেতেই হয়।

মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, খেলতে গিয়ে একটি আনি বড় মামার বালিশের তলা থেকে নিয়ে আসতে হবে।

তার পরেই কে যেন কানে-কানে ফিস্ ফিস্ করে বললে, অ্যাঁ! চুরি করবি? আবার দুষ্ট বুদ্ধিও আর এক জন সঙ্গে সঙ্গে কথা জুগিয়ে দিলে, আরে বোকা! এতে আর দোষ কি? পরের বাড়ী থেকে ত' আর চুরি করছিস্ নে! এ ত নিজের মামা বাড়ী। না হয় আনিটা পরে রেখে গেলেই হবে! তাই বলে মাছের ছানা বেরুবে না পট্‌কা থেকে?

শেষ কালে দারুণ কৌতূহলেরই জয় হল। যখন দেখলাম ঘরে কেউ কোথায়ও নেই—টুক করে বালিশটা তুলে নিয়ে একটা আনি পকেটে পুরে পালিয়ে এলাম।

কিন্তু কোথায় মাছের ছানা—? একদিন যায়—দু' দিন যায়—তিন দিন যায়—শেষকালে দেখা গেল পট্‌কাটাই ফেটে গেছে! সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত প্ল্যানও মাটি!

আনিটা অবশ্য যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তাই বলে চুরির অপরাধটা ত' আর কাটেনি?

ছেলেবেলাকার আর একটি অপরাধ গোপন করার কথা মনে পড়ছে।

আমাদের পূবদ্বারী ঘরের দক্ষিণ দিকের ছোট্ট কুঠুরীতে একটি আল্‌না ছিল। খুব পল্‌কা আল্‌না—হালকা কাঠ দিয়ে একটু সৌখীন ভাবে

তৈরী। সেই আল্‌নায় থাকতো আমাদের জামাকাপড়, মামীর সাড়ী, ব্লাউজ সব সাজানো।

সেদিন কি একটা তাড়াহুড়োর কাজে জলদি করে জামা পরে বোধ করি খেলাধূলার ব্যাপারে ছুটতে হবে। আমার জামাটা ঝোলানো আল্‌নার সব চাইতে উঁচু ডাণ্ডার সঙ্গে। একবার হাত উঁচু করে যখন ওটাকে হাতানো গেল না—তখন খুব তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করবার জন্য আল্‌নার একটি ডাণ্ডার ওপর পা দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মটাৎ করে গেল সেটা ভেঙে!

কাজটা যে খুব গোলমেলে হল সে কথা বেশ বুঝতে পারলাম। কিন্তু তখন আর গালে হাত দিয়ে বসে ভাববার সময় নেই। এক্ষুণি খেলার দলে গিয়ে হাজির না হলে হয়ত যোগ দিতেই পারবো না। তাই তাড়াতাড়ি করলাম কি, একটা দড়ি দিয়ে ভাঙা ডাণ্ডাটা বেঁধে ফেললাম, তারপর কতগুলো জামা-কাপড় দিয়ে দুর্ঘটনার যায়গায়টা ঢেকে রেখে চুপি চুপি পালিয়ে এলাম খেলার মাঠে।

দিন দুয়েকের মধ্যে ব্যাপারটা আর ধরা পড়ল না।

হঠাৎ কে যে গোয়েন্দাগিরি করে এই সাজ্ঘাতিক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে বসল সে কথা আজ মনে নেই। তবে কে ওই কাণ্ডটি করেছে তাই নিয়ে তোলপাড় সুরু হয়ে গেল গোটা বাড়ীতে। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আসল কথা জান্‌বার জন্যে আরো তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ডিটেক্‌টিভের প্রয়োজন।

লোকের পকেট কাটার কাজে নতুন যার শিক্ষানবিশী সুরু হয়েছে, গলির মোড়ে পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ীটা দেখলেই তার যেমন মুখখানি আপনা থেকেই শুকিয়ে ওঠে আর গলা কাঠ হয়ে জল-তেষ্টা পায়—আমার অবস্থা অনেকটা ঠিক সেই রকমই হল। পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করি সব সময়। মোট কথা আমি নিজেই আমার হাব-ভাব দিয়ে ধরা দিলাম যে—এ নাটের গুরু আমি ছাড়া আর কেউ নয়।

বেশ কিছু উত্তম-মধ্যম যে লাভ হয়েছিল সেটা মনে আছে। তবে

মনে মনে বিচার করে আগে থাক্তেই ধরে নিয়েছিলাম যে, এটা আমার প্রাপ্যই ছিল। যাই হোক—একটা সমস্যার একেবারে সমাধান হয়ে গেল—আর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে না। খেলতে গিয়েও বারে বারে ভাঙা আলনার দড়িটা গলার রজ্জু হয়ে উঠবে না!

পাওনা-গণ্ডা একেবারে চুকে গেল, এইবার একেবারে নিশ্চিন্দি।

এই ঘটনার সঙ্গে আর একটি ঘটনা মনের কোণে উঁকি মারে। সে দিন মনে করেছিলাম—শাস্তিটা আমার প্রাপ্য নয়—মিছিমিছি আমার ওপর সেটা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

যে বয়সের গল্প বল্‌ছি—তখন মামী ছিল আমার সব চাইতে বড় বন্ধু। গল্প শোনাতে মামী, খেলার সাথী মামী, পড়ার বইয়ে সুন্দর মলাট লাগিয়ে নাম লিখে দিতে মামী ছাড়া আর কারুর কাজ আমার পছন্দ হত না। কাজেই মামীর কথা ছিল আমার কাছে বেদবাক্য।

সেই মামী আমায় একদিন ডেকে বললেন, এই পোষ্টকার্ডটা নিয়ে যা—কাউকে দেখাবি নে—একেবারে সোজা পোষ্টাপিসে ফেলে দিবি।

এই জাতীয় মজাদার কাজে আমার চিরদিনের আনন্দ। শুধোলাম, ও! কলকাতায় দিদিমাকে লিখেছেন বুঝি?

মামী শুধু মুচকি হেসে মাথা নাড়লেন, কোনো জবাব দিলে না।

পোষ্টকার্ডের দিকে চেয়ে দেখলাম—ক্ষুদি ক্ষুদি অক্ষরে অনেক কিছু লেখা আছে। মনে করলাম খুব জরুরী চিঠি বুঝি—। এক ছুটে একেবারে পোষ্টাপিসে গিয়ে হাজির হবো—এই ছিল আমার মতলব।

ঠিক দৌড় দেবার মুখে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন মামা। বললেন, কোথায় যাচ্ছিস্ রে? পোষ্টাপিসে বুঝি? চিঠিখানা দেখি—

আমি পোষ্টকার্ডখানা মামার হাতে তুলে দেবো কি না একটু ইতঃস্তত করছি—মামী ইসারা করে হাসতে হাসতে জানালেন, না। ততক্ষণে মামা আমার হাত থেকে চিঠি নিয়ে পড়তে সুরু করে দিয়েছেন।

আমার মনে হল, মামী আমাকে যে কাজের ভার দিয়েছেন—আমি বুঝি তার অযোগ্য হয়ে গেলাম। হয়ত চিঠিতে এমন দরকারী কথা

লেখা আছে যা আর কেউ জান্‌লে মামীর ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে। ছেলেমানুষী বুদ্ধি আর কাকে বলে!

আমি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ছোঁ মেরে মামার হাত থেকে পোষ্টকার্ড-খানা কেড়ে নিলাম।

মামার কাছে কোনো দিন মার খাইনি—শুধু আদরই পেয়েছি। কিন্তু সে দিন হঠাৎ তিনি রেগে গিয়ে আমার কান পাকড়ে ধরে বললেন, এক ঠেঙে হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্।

তাঁর আদেশ অমান্য করবার শিক্ষা আমরা পাইনি। ঠিক সেই রকম ভাবে এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—কোনো প্রতিবাদ করলাম না, শুধু দারুণ অভিমানে চোখ দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

মামাকে মামী বললেন, তুমি ত আচ্ছা মানুষ! আমি ওকে বারণ করেছি আমার চিঠি কাউকে না দেখাতে। ও আমার কথা রেখেছে। ওকে মিছিমিছি শাস্তি দিলে চল্‌বে কেন?

আমি রেগে অনেকক্ষণ ওই ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মামীর অনুরোধেও পা নামাতে রাজি হইনি।

সে দিন কিশোর মনে এই প্রশ্নই জেগেছিল—কোন দোষ করিনি, তবু কেন শাস্তি পাবো?

পরে অবশ্য মামী আমায় আদর করে কাছে টেনে নিলেন। কিন্তু এই ঘটনার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে এবং বহু কাল ধরে এই সাজা আমার মনে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল।

ছেলেবেলায় আমরা দু' ভাই পালা করে ম্যালেরিয়ার ভুগতাম। জ্বর যখন আস্‌ত একেবারে হু-হু শব্দে কাঁপুনীর সপ্তম স্বর্গে পৌঁছে দিত। কাঁথার ওপর কাঁথা চাপিয়ে দেয়া হত শরীরের ওপর। কিন্তু তাতেও শীত মানে না। হিমালয়ের শিখরে কিম্বা এস্কিমোদের দেশে চলে গেছি কি না কে জানে? তারপর চাপানো হত লেপ আর কম্বল। সারাটা দেহ তবু ভূমিকম্পের মতো কাঁপতে থাক্‌ত।

ছেলেবেলায় গল্প শুন্‌তাম, 'ভালুকে জ্বর' না কি ঠিক এই রকম। হু-হু শব্দে আসে, জ্বরে কোঁ-কোঁ করে কাঁপতে থাকে ভালুক, আবার কখন যে সেই দারুণ জ্বর পালিয়ে যায় ভালুক তার হদিশ পায় না!

আমাদেরও অনেকটা সেই অবস্থা! দিব্যি ভালো আছি, রদ্দুরে রদ্দুরে ঘুরে ফল-পাকড় খাচ্ছি, খেলাধুলা করে বেড়াচ্ছি নিজের ইচ্ছে মত, আর দিদিমার ভাণ্ডার থেকে পিঠে-পায়েস খাওয়াও বাদ যাচ্ছে না—হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হল—ভালুকে-জ্বর—আর সব-কিছু একেবারে এক দিনে বন্ধ।

এই রকম ভালুকে-জ্বর মাসের মধ্যে বেশ কয়েক পালা হয়ে যেতো। শীতটা যখন হু-হু করে সারা দেহ কাঁপিয়ে আস্‌ত তখন বেশ ভালই লাগত। কিন্তু তার পরেই জ্বর যখন নাম্‌তে থাক্‌ত—শরীরটা যে কী খারাপ হত—তা বলবার নয়। মুখ হত বিস্বাদ। সারা দেহকে কে যেন হামান-দিস্তে দিয়ে ভেঙে-চুরে-গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। প্রথম দিকে থাক্‌ত যেমন প্রচুর জলকেষ্টা—শেষ কালে জল আর মুখে দেয়া যেত না। আর সমস্ত দেহে-মেনে যেন কী খাই কী খাই ভাব!

একেবারে যেন বক রাক্ষসের ক্ষিদে।

যা পাবো—দু'হাতে সব মুখে পূরে দেবো এমনি অবস্থা। যেদিন অন্নপথ্য করবো—তার আগের দিন রাত্তিরে ঘুম আর কিছুতেই আসে না। কখন ভোর হবে, কখন মার হাতের রান্না মাছের ঝোল ভাত খাবো, শুধু সেই চিন্তা।

রাত হবে তখন তিনটে। বাড়ী শুদ্ধু লোক ঘুমুচ্ছে। আমিও ঘুমুচ্ছি মার পাশে শুয়ে। হঠাৎ কা-কা শব্দ শুনে মনে হল ভোর হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলাম, ভোর হয়ে গেল যে, আর কত ঘুমুবে? ওঠো না! আমি যে আজ ভাত খাবো!

আমার আচম্‌কা ধাক্কা খেয়ে মা ধড়মড় করে উঠে বসল। তারপর একবার দরজা খুলে বাইরে ঘুরে এসে বললে, দূর বোকা! এখন যে শেষ রাত্তির রে! জ্যোৎস্না দেখে কাক অমন ডাকে।

লজ্জা পেয়ে পাশ ফিরে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সকাল থেকে আমার তাগিদে বাড়ী শুদ্ধু লোক অস্থির। খুব পুরোনো চালের নরম ভাত না হলে কিন্তু আমি খাবো না। দিদিমা আর মা যে আগে থেকেই পুরোনো সরু চালের ব্যবস্থা করে রেখেছে তা ত আমি জানি না!

তাই ওরা আমার কথার কোন উত্তর দেয় না—শুধু মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে থাকে।

জ্বরের পর প্রথম যেদিন ভাত খাবো সেদিন মার দুর্গতি আর ছুটোছুটির অন্ত থাকে না।

আমার রান্না করে, আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে ঠাণ্ডা করে—ডুব দিয়ে গিয়ে আবার হবিষ্যি ঘরে ঢুকতে হবে।

বছরের সব দিন ঠাকুরের রান্না চলবে কিন্তু জ্বরের পর যে প্রথম অন্নপথ্য করা সেটি মার হাতের রান্না না হলে চলবে না।

এই দিন মাকে বাড়তি খাটুনি সহ্য করতেই হবে।

রান্নাঘরের বারান্দায় চলেছে মার রান্না, আর আমি পূবদ্বারী ঘরের উত্তর দিকের দরজার চৌকাঠে বসে প্রহর গুণছি।

খানিকক্ষণ হয়ত চুপচাপ বসে রইলাম, তারপর প্রশ্ন করলাম,

—আচ্ছা মা পটল সেদ্ধ দিয়েছ ত?

হ্যাঁ রে হ্যাঁ!

—শিং মাছের ঝোল কিন্তু আজ কোরো না—

—তবে?

—ধনে পাতুরী করো, বেশ লাগবে খেতে।

—আচ্ছা, আচ্ছা—

এই রকম কাটা কাটা কথা চলে খানিকক্ষণ।

—মাছ পাওয়া গেছে ত?

—পাগাড়ে যখন গেছে—তখন কি আর মাছ না নিয়ে ফিরবে? পাগাড়ের কথা মনে পড়ে।

সবাই ওকে ডাকে—'পাগাইড়্যা' বলে।

খাল-বিল-নদী-নালা-পগাড়ে কেবলি মাছ মেরে বেড়ায় বলেই ওর পাগাড়ে নাম হয়েছে কি না বলা শক্ত।

তবে মামী বেশ মজার কথা বলেন। ওর না কি মৎস্য রাশি। মাছ সংগ্রহ করতে গিয়ে পাগাড়ে কখনো বিফল মনোরথ হয়নি। ও যেখানে বঁড়শী ফেলে বস্‌বে—মাছেদের নাকি সেখানে না এসে উপায় নেই! মাছেরা পাগাড়ের হাতে মরতে এত ভালোবাসে—সত্যি ভারী মজার ব্যাপার!

সারা গ্রাম টই-টম্বুর জলে ভর্ত্তি—মাছেদের টিকিটি দেখবার যো নেই—কেউ মাছ সংগ্রহ করতে পারছে না—পাগাড়েকে খবর দাও, ও ঠিক জুটিয়ে আন্‌বে' খন।

মামী নাক কুঁচকে বলেন, নিরিমিষ আমি খেতে পারি নে। একটু আঁস্‌টে গন্ধ না হলে কি ভাত খাওয়া যায়? পাগাড়ে যাক, ও ঠিক জোগাড় করে নিয়ে আস্‌বে।

এতটুকু বাড়িয়ে বলেননি তিনি। পাগাড়ে ঠিক হাস্‌তে হাস্‌তে একটি মাছ নিয়ে এসে হাজির হল। বেঁটে খাটো কালো-কোলো মানুষটি। ছোট ছোট চুল। কিন্তু মুখে হাসি লেগেই আছে।

আর এক জন ছিল, তার তার যোলই।

মৎস্য-মেধ যজ্ঞ করতে সেও কম যায় না।

যে বাড়ীতে যোলই কাজ করে সে বাড়ীর গেরস্তরা নিজেদের ভাগ্য-বান বলে মনে করে। এমনি ঘরের কাজ ত' হবেই, তা ছাড়া যখন-তখন জুট্‌বে মাছ।

সেই জন্যে গেরস্ত বাড়ীতে যোলইকে নিয়ে লোফালুফি চলে।

জ্বরের পর অন্নপথ্য করার গল্প থেকে একেবারে রসনা-তৃপ্তিকর মৎস্য-কাহিনীতে এসে পড়েছি।

আমি যে সময়ের কথা বলছি—তখন আমাদের গাঁয়ে এই ছড়াটাই সব সময় আনাগোণা করতো অনেক ছেলের মনে—

"লিখিব, পড়িব মরিব দুখে—
মৎস্য মারিব, খাইব সুখে।"

আজ আমার ছেলেবেলাকার আর এক বন্ধু ঘুপুর কথা জাগছে মনে। ঘুপু একটা ছোট বঁড়শী নিয়ে—নানা পুকুর আর ডোবার ধারে ঘাপ্‌টি মেরে চুপচাপ বসে থাক্‌ত। বড় বড় কৈ মাছ গেঁথে তুল্‌তে ঘুপুর হাত ছিল একেবারে সব্যসাচীর মতো। ওর শীকার-কাহিনী ছিল সর্ব্বজনবিদিত। বড় হয়ে ঘুপু একজন নামকরা লাঠি খেলোয়াড় হয়েছিল। শরীরচর্চ্চা করে নিজের স্বাস্থ্যের একেবারে নতুন রূপ দিয়েছিল। কিন্তু ছেলেবয়েসের ঘুপুকে দেখে সে কথা বোঝবার যো ছিল না।

শুভার্থী আর কল্যাণকামীরা ওর কাণ্ডকারখানা দেখে বল্‌ত,—ওরে ছোঁড়া, তুই যে রকম আদাড়ে-বাদাড়ে আর জলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াস্—কোন্ দিন শুন্‌বো সাপে তোকে কেটে রেখেছে!

ঘুপু কোনো প্রতিবাদ করত না—শুধু খিল্ খিল্ করে হাস্‌তো! সেই লিক্‌লিকে কালো ভয়লেশহীন ছেলেটা যে বড় হয়ে আবার লাঠি ও তলোয়ারের খেলায় সারা বাংলায় নাম করবে সে কথা সে দিন কে ভেবে রেখেছিল? স্বদেশী করে দীর্ঘকাল কারাবরণও করেছিল সে। অকালমৃত্যু ঘুপুর কর্ম্মমুখর জীবনে ইতি টেনে দিয়েছে।

ছেলেবেলায় প্রথম যে উপহার পেয়েছিলাম—সে কথা আমার মনের অদেখা খাতায় আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

মামাবাড়ীতে খুব আদুরে ছিলাম বলে বেশী বয়সে আমার লেখাপড়া স্বরু হয়।

একবার মামা কলকাতা থেকে দেশে এসে মত প্রকাশ করলেন যে, আর আমার আল্‌গা-আল্‌গা ভাবে আদর কাড়লে চল্‌বে না। এইবার থেকে লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

তিনি নিজেই গিয়ে গ্রামের মাইনর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দিলেন। ইস্কুলটির নাম সাকরাইল গ্র্যাণ্ট-ইন্-এইড্ এম-ই স্কুল। তীর্থবাসী পণ্ডিত হচ্ছেন এই বিদ্যালয়ের প্রাণ। অন্যান্য সব শিক্ষকদের ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে-থুয়ে যে ক'টা টাকা অবশিষ্ট

থাকে তাই হাসিমুখে গ্রহণ করেন; কিন্তু খাতায় সই করতে হয় বেশী অঙ্কের পরিমাণ। আমারই এক আত্মীয়-বাড়ী থাকা-খাওয়ার বদলে ছেলে-মেয়েদের পড়ান। তিনি ভিন দেশের মানুষ, কিন্তু ইস্কুলটা যেন তাঁর জীবন। শুনতে পাই আমাদের গাঁয়ের তিন পুরুষ তাঁর কাছে লেখাপড়া করেছে। তাই গ্রামে তীর্থবাসী পণ্ডিতের সম্মান সব চাইতে বেশী।

এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার আগে আমি রজনী পণ্ডিত মশায়ের কাছে কিছুদিন পড়েছিলাম এবং আমার অক্ষর-পরিচয় হয় সর্ব্বপ্রথম তাঁর কাছেই।

কিন্তু তীর্থবাসী পণ্ডিতের খ্যাতি আর সম্মান ছিল সর্ব্বজন-বিদিত। গ্রামের যে কোনো বাড়ীতে উৎসব কিম্বা নেমন্তন্ন থাকুক—তীর্থবাসী পণ্ডিত সেখানে আমন্ত্রিত হবেনই। সারাটা গ্রামের লোক তাঁকে একেবারে আলাদা চোখে দেখতো।

বড় হয়ে আমরা তাঁর ছাত্রের দল যখন "তীর্থবাসী-জয়ন্তী" উৎসব করেছিলাম এবং তাঁর হাতে ১০১৲ টাকা তুলে দিয়েছিলাম নিজেরা চাঁদা করে, সেদিন তাঁর মুখে যে তৃপ্তি ও সাফল্যের হাসি দেখেছি তা কোনো দিনের তরেও ভুলতে পারবো না।

কত বার দেখেছি, পণ্ডিত মশায়ের ছেলে এসে সাধাসাধি করে গেছে দেশে ফিরে যাবার জন্যে—; বুড়ো বয়সে তিনি নিজে হাতে রান্না করে দিনের পর দিন ভাতে-ভাত খেয়েছেন আর কচ্ছপের কামড় দিয়ে মুমূর্ষু বিদ্যালয়কে কোনো রকমে জিইয়ে রেখেছেন—সেই সব কাহিনী কোনো ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে না। তীর্থবাসী পণ্ডিতের সেই আজীবন-তপস্যা আর সাধনা আজ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

যাক্‌, আমার ভর্ত্তি হবার যে কাহিনী বলছিলাম। আমি যখন ভর্ত্তি হলাম—তখন এই বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার হচ্ছেন গাঙ্গুলী মশাই। তাঁর পরিচয় আগেই দিয়েছি।

মামা ভর্ত্তি করে দিয়েই আবার সঙ্গে করে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে

এলেন। বললেন, আজ রাত্তিরেই বই কিনে দেবেন। টাঙ্গাইল শহর আমাদের গ্রাম থেকে মাত্র দেড় মাইল দূর। কাজে-অকাজে হামেশা সেখানে লোক যাতায়াত করে। সেই টাঙ্গাইল থেকে বই নিয়ে আস্‌বে কুইনা মামা।

সারাটা বিকেল ছট্‌ফট্ করে কাটল। কখন নতুন বই আস্‌বে, কখন সে বইয়ের ছবি দেখবো, মামী তাতে মলাট লাগিয়ে নাম লিখে দেবেন। কেবলি ঘর-বার করতে লাগলাম।

সেই বিকেল বেলাটা আর খেলাধূলায় মন বস্‌ল না। বাড়ীর সবাইকে জিজ্ঞেস করে ব্যতিব্যস্ত করে তুললাম—কখন কুইনা মামা সওদা করে ফিরে আস্‌বে!

ক্রমে সন্ধ্যে উৎরে গেল—তবু কুইনা মামার দেখা নেই। তাই ত! ভারী রাগ হল কুইনা মামার ওপর। আজ কি যত রাজ্যের জিনিস্ কিনে আন্‌ছে না কি? কেন, শুধু বইটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা যায় না?

আরো রাত বাড়লো—কিন্তু কোথায় কুইনা মামা?

আমার চোখ ঘুমে ঢুলে এলো—তবু মুখে প্রশ্ন, আমার বই কি এখনো এলো না?

মামী বললেন, তুই যদি ঘুমিয়ে পড়িস ত' তোর শিয়রে বই রেখে দেবো'খন। সকাল বেলায় চোখ মেলেই দেখতে পাবি—নতুন ঝক্‌ঝকে বই। এখন খেয়ে নে!

কিন্তু বই হাতে না পেয়ে খেতে আমি রাজি নই। সে রাত্তিরে কিচ্ছটি খেলাম না। ঘুমে চোখের পাতা বুঁজে এলো। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিশি যে কখন তাতে এসে ভর করেছে জানতেও পারিনি।

রাত্তিরেও বইয়ের স্বপ্ন দেখেছিলাম কি না ঠিক মনে নেই। কিন্তু খুব সকালে গেল ঘুম ভেঙে।

শিয়রে তাকিয়ে দেখি সত্যি ত!

ইস্কুলে যে বই পড়তে হবে—তাই রয়েছে ঠিক বালিশের পাশে! কুইনা মামা তাহলে অনেক রাত্তিরে ফিরেছিল আর মামীও তাঁর কথা

ভোলেননি। ঠিক আমার শিয়রে রেখে দিয়েছেন বইটি। কিন্তু তখনো আমার কাছে আসল বিষয় লুকোনো ছিল। সেই "নীতি-সুধা" বইটা টেনে নিতেই তার তলা থেকে উঁকি দিলে আর একখানি বই!

অবাক কাণ্ড!

এ বইয়ের কথা ত' মামা আগে বলেননি!

ওপরে চমৎকার ছবি—লেখা রয়েছে "হাসিখুসী"। আলিবাবার চোখের সামনে যে দিন চিচিং ফাঁক্ হয়ে গিয়েছিল—আর রাশি রাশি মণি-মুক্তো, হীরে-জহরৎ বেরিয়ে পড়েছিল সেদিন সেও বোধ হয় এতটা আশ্চর্য্য হয়নি যতটা আমি হয়েছিলাম সেদিন সকাল বেলা—পাঠ্যপুস্তকের তলায় এই "হাসিখুসী" আবিষ্কার করে।

এমন মজার বই আছে পৃথিবীতে?

সারাদিন ধরে নতুন বইয়ের মজার গন্ধ শুঁকতে লাগলাম, পাতার পর পাতা উল্টে ছবি দেখতে লাগলাম আর নাওয়া-খাওয়া ভুলে ক্রমাগত ছড়া আওড়াতে লাগলাম—

"অজগর আস্‌ছে তেড়ে
আমটি আমি খাব পেড়ে"

সত্যিকারের আমের চাইতে ছবির আম আর ছড়া যে এত মিষ্টি হয় সে কথা কি এর আগে জানা ছিল?

এই হল আমার জীবনে প্রথম ও সেরা উপহার।

আমার বড়মামার ছেলে ছোক্কন—একেবারে আমার সমবয়েসী। ওর কথা আগেই বলেছি। হয়ত আমার চ'ইতে দু'-এক মাসের ছোটই হবে।

সেই ছোক্কন কিন্‌লে এক ছাতা। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে ছাতা কেনা হল বটে—কিন্তু এই ছত্র-লাভ হওয়ায় তার বিপদ বাড়ল বৈ কমল না।

ছাতাটা খুলে মেঝের ওপর রেখে দেবে ছোক্কন—কিন্তু ছাতার যে

কয়টা শিক মাটি ছুঁয়ে থাক্‌বে তাদের কি করে বাঁচানো যায়—এই হল তার এক মহা সমস্যা।

অতি সাবধানী ছোক্কন ভেবে ভেবে আকুল। কিছুতেই কিছু ঠিক করতে পারে না। তবে কি অমন নতুন ছাতার শিকগুলি মৃত্তিকাস্পর্শে অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে?

ধ্যানীর সাধনা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সে স্থির করলে, যে শিকগুলি মাটি ছুঁয়ে আছে তাদের তলায় এক টুক্‌রো করে কাগজ দিয়ে রাখতে হবে এবং এই ভাবেই ছাতা অকালে বিলোপের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

আমাদের সরকার বাহাদুর ভারতের প্রাচীন মন্দির আর মূর্ত্তিগুলি রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছোক্কনের নতুন ছত্র রক্ষার জন্যে এ রকম কোনো কিছুরই ব্যবস্থা ছিল না।

সেটা কি ছেলেবেলায় তার কম দুঃখের কারণ হয়েছিল?

ছোক্কনের একটি গোপন তহবিল ছিল। পূজো-পার্ব্বণে তখন ছেলেদের হাতে পরবী দেয়া হত। কখনো দু'-আনা, কখনো বা একটি সিকি। আমার এই সব পার্বণী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেহিসাবীর মতো খরচ করে ফেলতাম। সেকালে এক রকম তক্তা-বিস্কুট পাওয়া যেত—তার ওপর চিনি ছড়ানো থাক্‌ত। ছোটদের কাছে এইটিই ছিল রাজসিক ভোজ। এ ছাড়া চানাচুরওয়ালার সঙ্গেও সব ছেলের মিতালী ছিল। ছোক্কন কিন্তু তার পরবীর একটি পয়সাও বিরাট সাম্রাজ্যের বিনিময়ে দিতে রাজি ছিল না! কাজেই তার পয়সা-কড়ি দিব্যি ছানা-পোনা নিয়ে গোকুলে বাড়তে থাকত।

এই গোপন ধন-ভাণ্ডার সে বিশেষ কৌশলের সঙ্গে রক্ষা করত। কোনো তোষকের তলায়, ঘাটের কোনো ভাঙা সিঁড়ির ফোঁকরে, কিম্বা কোনো গাছের কোটরে সে সযত্নে তার থলিকে লুকিয়ে রাখত। শুধু তাই নয়—সে বারে বারে গিয়ে যখন-তখন খুলে দেখত ভাণ্ডার ঠিক আছে কি না। তার পর একদিন যখন থলিটি কোনো কৌশলী

চোরের দ্বারা অপহৃত হত—তখন জানা যেত—ছোক্কনের গোপন তহবিলে সত্যি কত টাকা জমেছিল!

টেরী-বাগানোর কাজে ছোক্কনের কৃচ্ছ্রসাধনের অন্ত ছিল না। আমাদের ছেলেবেলায় এই কাজটি একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। কাজেই যেটা মানা—সেইটের ওপরেই সমস্ত ঝোঁক গিয়ে পড়ে।

আমরা সবাই গোপনে এই কাজটি সম্পাদন করতাম।

ছোক্কন যে ভাবে টেরী বাগাতে চায়—তার চুল সে নির্দ্দেশ মান্‌তে আদপেই রাজি নয়! ফলে চিরুণীর সঙ্গে চুলের রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ সুরু হয়ে যেত।

বাগ মানে না যে চুল, তাকে কি করে শায়েস্তা করতে হয়—সে মন্ত্র আমাদের জানা ছিল না।

আমি ত' শেষ পর্য্যন্ত একদিন রেগে গিয়ে পাকাপাকি টেরীর রাস্তা করবার জন্যে কাঁচি দিয়ে দিব্যি লম্বালম্বি চুল ছেঁটে ফেললাম। আমার টেরীর সেই অবস্থা দেখে খেলার সাথীদের মধ্যে যে হাসা-হাসির ধূম পড়ে গিয়েছিল—সে কথা আজও ভুলতে পারিনি! ওরা আমার নাম দিয়েছিল—'লক্ষ্মণ ঠাকুর'।

যে ছেলেটিকে গ্রাম শুদ্ধু সবাই রসিকতা করে 'গোয়ালন্দ' বলে ডাক্‌ত—তার আসল নাম ছিল—'প্রমদানন্দ'। প্রমদা গ্রাম সম্পর্কে আমার ভাগনে হয়। তার বাবার নাম বিমলানন্দ দাশগুপ্ত। খুলনা শহরে তিনি খুব নামকরা উকিল। এই 'গোয়ালন্দের' মাথায় অতি ছেলেবেলা থেকেই নানা রকম বুদ্ধি খেলত।

ওদের বাড়ীর নাম দক্ষিণ-বাড়ী। মামাবাড়ীর ঠিক দক্ষিণে বলেই বোধ করি এই নাম হয়েছিল। গোয়ালন্দ ছেলেবেলায় ছোট বঁড়শী দিয়ে মাছ মারতেও খুব ওস্তাদ ছিল।

হঠাৎ সে একদিন আমাদের নেমন্তন্ন করে বস্‌ল—ওদের বাড়ীতে নাকি থিয়েটার হবে।

গোয়ালন্দদের বাড়ী গিয়ে সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। খবরের

কাগজ আর ন্যাকড়া জোড়া দিয়ে বেশ বড় বড় সীন তৈরী করেছে। নিজেই রঙ গুলে তারা ওপর চমৎকার দৃশ্য এঁকেছে। সেইগুলি টানিয়ে দিয়েছে ওদের ঘরের বারান্দায়। ভাই-বোনেরা মিলেই অভিনয় করছে। কেউ সেজেছে রাজা, কেউ মন্ত্রী, কেউ রাজপুত্র, কেউ রাজকন্যা। আমরা দেখি, আর চোখ ফেরাতে পারিনে।

আগে দেখতাম গোয়ালন্দ ডোবার ধারে বসে ছোট বড়শী দিয়ে পুঁটি মাছ ধরছে। এখন দেখছি তার ভেতর কত গুণ! ও একাই একশ! ওর দিদিরা সব সাজিয়ে দিয়েছে। রাংতা দিয়ে নানারকম গয়না তৈরী করা হয়েছে। বাখারীর ওপর রঙ-বেরঙের কাগজ আট্‌কে তরোয়াল তৈরী করেছে। রঙীণ শাড়ী দিয়ে পাগড়ী বেঁধেছে রাজা মন্ত্রীর দল।

এইসব দেখে সেদিন কি ভালোই না লাগছিল। মনে মনে ভাবলাম, আমাকেও যদি ওই রকম একটা কিছু রাজা-উজির সাজিয়ে দিত তাহলে আমিও সীনের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কত রকম কসরৎ দেখাতে পারতাম! মনের আশা মনেই চেপে ওদের অভিনয় দেখলাম আর বার বার ওদের তারিফ করতে লাগলাম।

সেইদিন থেকে আমরা গোয়ালন্দের ভারী ভক্ত হয়ে পড়লাম।

দাদার ধারণা ছিল—আমার পিঠটা হচ্ছে বেওয়ারিশ মাল। যখন-তখন এসে তব্‌লা বাজিয়ে যাওয়া চলে। আর দাদা যখন বয়েসে আমার চাইতে তিন-চার বছরের বড় তখন জন্মগত সে অধিকার ত' আছেই।

কখন আমার পিঠে ভাদ্রের তাল এসে পড়ে সে জন্য বাড়ী শুদ্ধ লোক সব সময় তটস্থ থাকত।

এই সব গুরুতর ব্যাপারে আমার সান্ত্বনার যায়গা ছিল মামীর কোল।

পরিস্থিতি জটিল ও ঘোরালো হয়ে উঠলেই আমি সটান সেইখানে পালিয়ে যেতাম।

কিন্তু তাই বলে সব সময় যে নিষ্কৃতি পেতাম তা নয়। এই তাল-পড়া কিম্বা তব্‌লা-বাজানো ভবিষ্যতের জন্যে শিকেয় তোলা থাক্‌ত—এবং শুভ-মুহূর্ত্তে যথাস্থানে এসে পৌছুতে তার কিছুমাত্র ভুল হত না!

দাদা ইস্কুলের পড়া যা পড়ত···আমি চুপচাপ বসে মনোযোগ দিয়ে শুন্‌তাম। তার পর যা-কিছু শুনতাম অনর্গল বলে যেতাম—ঠিক-বেঠিক সুর মিলিয়ে।

এই সময়টা দাদা স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ খুব মুখস্থ করছিল। আমি কয়েকটা দিন বেশ কান পেতে শুন্‌লাম। তার পর একদিন মামীকে বললাম, এ ত' খুব সোজা—জিজ্ঞেস করলে আমিও বলে দিতে পারি।

মামী খুব কৌতুক বোধ করলেন, বললেন, আচ্ছা, বল ত স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ—কেমন শিখেছিস?

শুধু প্রশ্ন করার অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে চাবি-দেয়া কলের গানের মতো অনর্গল বলে যেতে লাগলাম—গাছ-গাছুনি, মাছ-মাছুনি, ঘর-ঘরুণী, পথ-পথুনী—

আরো অনেক কিছু হয়ত শোনাতে পারতাম—কিন্তু হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, মামী হেসে গড়িয়ে পড়েছেন, কাউকে ডেকে যে কৌতুকের ভাগ দেবেন—তাঁর সে ক্ষমতাও নেই!

ব্যাপার দেখে ভারী দমে গেলাম। আমার এই কৃতিত্বে এত হাসির ব্যাপার কি আছে, কিছুই বুঝতে পারলাম না!

কানুকে ভোলা আমার পক্ষে সহজ নয়।

কানু, মামার ছেলে।

আমার জীবনে কানুই হচ্ছে প্রথম শিশু—যাকে প্রাণ ভরে আদর করতে আর ধমক দিয়ে কাঁদাতে পারতাম।

সত্যি কথা বলতে কি, কানুকে আমি একটা খেলনা বলেই মনে করতাম।

প্রথম জীবনে মামীর সন্তান হয়ে বাঁচত না। কয়েকটি শিশুর অকালমৃত্যুর পর মামীর কোলে এলো কানু।

এই কানু আমাদের কাছে হল সাত রাজার ধন মাণিক। তখন কানু ছাড়া আর যেন কিছু ভাবতে পারতাম না—

মনে হত, কানু রোজ কেন আরো বড় হয় না? তাহলে ত' ওর হাত ধরে উঠোনে ছুটোছুটি করতে পারতাম, দু'জনে দূর্ব্বো আর কাঁটালপাতা জোগাড় করে নিয়ে এসে ছাগলকে খাওয়াতে পারতাম, কিম্বা ওর হাতে শ্লেট-পেন্সিল গুঁজে দিয়ে ইস্কুলে নিয়ে যেতে পারতাম। এজন্যে আমার জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না।

যখন ইস্কুলে থাক্তাম—কেবলি মনে হত, কখন বাড়ী ফিরে যাবো—কানুকে দেখতে পাবো—তার সঙ্গে হাসবো আর হাততালি দেবো।

মামী উত্তর দিতেন, বড় হবে বৈ কি! বড় হয়ে ত' তোর সঙ্গেই খেলাধূলো করবে, ছুটোছুটি করবে, দুষ্টুমী করবে—

দাদী মাসি কিম্বা হরি পিশি একদিন বলেছিল ঝাল খেলে নাকি তাড়াতাড়ি বড় হয়।

একদিন ওকে একটা লঙ্কা খাওয়ানরও ইচ্ছে ছিল—কিন্তু পাছে মারধোর খেতে হয় তাই সাহস পাইনি।

একদিন শোনা গেল—কানুর মুখে-ভাত হবে। অন্নপ্রাশন। কি মজা! ও নাকি প্রথম ভাত খাবে—মিষ্টি পায়েস খাবে—রসগোল্লা খাবে—আরো কি সব খাবে। ওর জন্যে সোনার গয়না তৈরী হবে—স্যাক্‌রা-বাড়ীতে ফরমাস গেল। মুখে ভাতের দিন অনেক লোকের নেমন্তন্ন। পুকুরে জাল ফেলা হবে—মাছ উঠবে অনেক।

আনন্দে আর উল্লাসে আমার চোখে ঘুম নেই!

অনেক পরামর্শ করে ফর্দ্দ তৈরী হচ্ছে—কাকে কাকে নেমন্তন্ন করা হবে। কলকাতা থেকে মামীর ভাই পাঁচু মামা আস্‌বেন। তিনিই নাকি কানুর মুখে ভাত দেবেন। মামাকেই মুখে ভাত তুলে দিতে হয়।

নানা রকম গল্পে বাড়ী একেবারে সরগরম।

আর কটা দিন কাটাতে পারলে সারা বাড়ীতে পুলকের বন্যা বয়ে

যাবে এই কথা ভেবে আমি কেবলই ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলাম।

একবার এ-ঘর—আর একবার ও-ঘর।

মনে হল—আমার যদি খুব গায়ে জোর থাক্‌ত তবে মাঝের দিনগুলোকে ঠেলে একেবারে হটিয়ে দিতাম পেছনে।

তার পর একেবারে আনন্দের হাট।

কিন্তু মৃতু যে গোপনে পা টিপেটিপে এগিয়ে এসেছে সে কথা আমরা কেউ ভাবতেও পারিনি!

কুষ্ঠি, ঠিকুজী, দিনক্ষণ কত কি বিচার করেই না অন্নপ্রাশনের শুভদিন ধার্য্য করা হয়েছিল।

কোনো পণ্ডিত কি সত্যি করে গণনা করতে পারে না?

সেই নির্দ্ধারিত শুভদিনের আগেই মৃত্যু তার থাবা মেলে সকলকার মাঝখান থেকেই মামীর কোল খালি করে কানুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল!

জীবনে মৃত্যুকে এই প্রথম সাম্‌না-সাম্‌নি দেখলাম!

সে বয়সে আর কতটুকুই বা বুঝতে পেরেছিলাম!

কিন্তু সেদিনকার সেই কিশোরের মনে যে আঘাত লেগেছিল তাতে সাময়িক ভাবে তার ঠোঁটে কে যেন বোবা-কাঠি ছুঁইয়ে দিলে!

কানুর সেই ফুল-তোলা কাঁথা—যার ওপর শুয়ে সে হাত-পা নেড়ে খেলা করত, সেই ঝিনুক-বাটি যাতে করে সে দুধ খেতো, ছোট বালিশ, যার ওপর মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে থাক্‌ত—সব যেন কাঁকর হয়ে চোখে বিঁধতে লাগলো।

ভাল করে খেতে পারি নে, রাত্তিরে ঘুমুতে পারি নে, কেবলি চম্‌কে চম্‌কে উঠি।

আমার মনে হত নিশীথ রাতে কানু যেন হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমার কানের কাছে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠছে!

আমি চম্‌কে চম্‌কে উঠি। বাড়ী-শুদ্ধু লোক তখন আমার সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়ল। গাঁয়ের কা'কে ডেকে যেন ঝাড়-ফুঁক করা হল।

সেকালের নিয়ম অনুযায়ী 'বাড়ী-বন্ধন'ও করা হয়েছিল্। কাঃর আত্মা নাকি বাড়ী ছেড়ে যায়নি!

আমার মনে এই ভয়-ভয় ভাবটা বহু কাল ছিল। সেই থেকে মামাবাড়ীতে অন্নপ্রাশন উৎসব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সেকালে আমাদের গাঁয়ে কুমারীপূজো আর কুমারী ভোজন করানোর প্রথা ছিল। দিদিমা প্রতি বছর কুমারীপূজো করতেন।

একবারের ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। আমার এক সহপাঠী বন্ধু ছিল, তার নাম টোনা ঠাকুর। সেই টোনা ঠাকুরের দিদিকে কুমারী হিসেবে দিদিমা নেমন্তন্ন করেছিলেন।

ব্রাহ্মণকন্যাকে বসিয়ে তাকে দেবতার মতো পূজো করতে হয়। কুমারী মেয়ে ত' মা ভগবতীর অংশ—সেই মনোভাব থেকেই বোধ করি কুমারীপূজোর প্রচলন হয়েছে।

একটা জ্যান্ত মানুষকে বসিয়ে কেউ পূজো করছে—এটা দেখতে আমার ভারী মজা লাগছিল।

আমি ভাবছিলাম—পূজোর পর মেয়েটাকে কাঁধে করে নিয়ে খালে কিম্বা পুকুরের জলে বিসর্জ্জন দিতে হবে নাকি? যেমন নাকি অন্যান্য প্রতিমার বেলায় হয়ে থাকে?

মেয়েটার পায়ে আলতা পরিয়ে তাকে আবির দিয়ে প্রণাম করা হল—পূজোর পর। তার পর থালা থালা সব খাবার সাজিয়ে দেয়া হল ওর খাওয়ার জন্যে।

ঐটুকু মেয়ে আবার কতটুকু খাবার খাবে? পরে সব ছেলে-মেয়েদের হাতে হাতে ভাগ করে দেয়া হল।

যে থালায় মেয়েটি খেয়েছিল—তার থেকে অনেকগুলি ভালো মিষ্টি আর সাবু-মাখা তুলে নিয়ে দিদিমা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, নে—খা!

খুব ছেলেবেলা থেকেই আমি কারো পাতের জিনিষ খেতে পারি না। মেয়েটির পাতের খাবার হাতে দেয়ায় আমার গা ঘিন্ ঘিন্

করতে লাগলো। কী তুষ্টু সরস্বতী যে মাথায় চাপলো বলতে পারি নে!

সবগুলি খাবার দিদিমার গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। সবাই একেবারে হা-হা করে উঠল।

দিদিমা আমায় বকাবকি করতে লাগলেন। তার পর গামছাটা কাঁধে ফেলে তিনি আবার চললেন পুকুর ঘাটে নাইতে।

যে খাবার এতক্ষণ ছিল প্রসাদ—আমার ছোঁয়ায় তা নাকি উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে—তাই দিদিমাকে স্নান করে 'শুদ্ধ' হতে হবে!

প্রসাদকে অবহেলা করা, আর এই গুরুতর অপরাধের জন্য সেদিন মার কাছ থেকে খুব উত্তম-মধ্যম লাভ হয়েছিল!

আমরা তু' ভাই যখন খুব ঘন ঘন ম্যালেরিয়ায় ভুগতে সুরু করলাম—তখন বাড়ীর তিন কর্তা—ছোট আজামশাই, বড় মামা আর মামা পরামর্শ করে স্থির করলেন—আমাদের স্থান পরিবর্ত্তনের একান্ত প্রয়োজন।

দিগিন্দ্রপ্রসাদ সেন—পাশের সন্তোষ গ্রামের প্রমথ-মন্মথ রায়-চৌধুরীর পাঁচ আনি ষ্টেটে কাজ করেন। তিনি তখন পাবনার অন্তর্গত ম্যাছরা কাছারীর নায়েব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দিগিন্দ্রপ্রসাদের মতো দিলখোলা, পরোপকারী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ মানুষ সে যুগে আমাদের গাঁয়ে খুব কমই ছিলেন। গোটা গ্রামে তিনি কেঠু বাবু নামে পরিচিত ছিলেন। আর সম্পর্ক হিসেবে তিনি ছিলেন আমাদের কেঠুদা।

এই ম্যাছরা যায়গাটা তখন নাকি খুব স্বাস্থ্যকর ছিল। কাজেই স্থির হল, আমরা তুই ভাই—মার সঙ্গে ম্যাছরা গিয়ে কেঠুদার কাছে বেশ কিছু দিন থাকবো—তাহলেই ম্যালেরিয়া পালাতে পথ পাবে না।

তখনকার দিনে নদীপথে বড় নৌকো করে যাতায়াত করতে হত। গ্রামের বাইরে এই আমরা প্রথম যাচ্ছি।

কাজেই শিশু-মনে কৌতূহলের অন্ত ছিল না! 'মালোয়ারী' ছাড়ুক আর না ছাড়ুক নতুন যায়গা ত' দেখে নেয়া যাবে।

একটা শুভদিন দেখে নৌকো করে আমরা রওনা হলাম। এ বাড়ীর তিন কর্ত্তার সঙ্গে পরামর্শ করে কেঠু দাদাই সে ব্যবস্থা করেছিলেন।

গ্রামের বেষ্টনীর বাইরে নদীপথে এই নৌকো-ভ্রমণ একসঙ্গে দেহ-মন যেন একেবারে শীতল করে দিল।

দু' চোখে যা দেখি—তাতেই উচ্ছসিত হয়ে উঠি!

নৌকো যখন পাল তুলে দিয়ে চল্‌তে থাকে—এক দিকে প্রকৃতির শ্যাম শোভা, অন্য দিকে তীর দেখা যায় না—এমন নদীর বিস্তার! গাঙ্‌চিলেরা দূর আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে—হালকা মেঘ ভাস্‌ছে নীল গগনের গায়, নদীর স্রোত আবর্ত্ত রচনা করে কেবলি ছুটে চলেছে কোন্ অসীমের সন্ধানে।

যে দিকটায় তীর খুব কাছাকাছি সেখানেও ছায়াছবির মতো পট পরিবর্ত্তিত হচ্ছে ক্ষণে-ক্ষণে!

কচি কলাগাছের পাতা বাতাসে হেল্‌ছে, দুল্‌ছে—রাশি-রাশি কাশফুলের বন সাদা হয়ে ছেয়ে আছে নদীর তীর। মাঝে মাঝে কৃষকদের ছোট-ছোট কুটির। চাষার মেয়েরা মাথায় দুধের কলসী নিয়ে চলেছে হাটের পথে। কৃষকদের ধামায় তাজা তরি-তরকারী একেবারে লক্‌লক্ করছে। এক্ষুণি তুলে আনা হয়েছে সব্জী-ক্ষেত থেকে। কোথাও বা নদীর ঘাটে বৌ-ঝিরা স্নান করছে। কেউ বা স্নান করার ফাঁকে ঘোমটা তুলে পাল তোলা নৌকোটাকে একবার দেখে নিচ্ছে।

দামাল ছেলের দল—জল ছিটিয়ে, দুরন্তপণা করে, সাঁতার কেটে নদীর ঘাট তচ্‌নচ করে তুলেছে। পারের কাছ দিয়ে যে সব নৌকো যাচ্ছে—সাঁতারুদের মধ্যে কেউ কেউ ঢেউয়ের দোলায় ভেসে এসে তার হালটা আঁক্‌ড়ে ধরছে! বেশ খানিকটা চলে যাবার পর আবার ছেড়ে দিচ্ছে নৌকোর হাল। ঢেউয়ের দোলায় তাদের ভাসিয়ে নিয়ে

যাচ্ছে দূরে—দূরে—অনেক দূরে ! মোচার খোলার মতো তাদের মাথাটা কখনো ভাস্‌ছে—আবার কখনো ডুবছে।

নৌকোর পাটাতনে বসে মাঝিরা পালা করে তামাক সেজে টান্‌ছে। একজন চীৎকার করে উঠল—ওই পানকৌড়ি।

কোন্ ছেলে ভুলোনো ছড়ায় যেন পানকৌড়ির নাম শুনছিলাম। কাজেই তাকে দেখবার আগ্রহ আমার কম ছিল না।

উঁকি-ঝুঁকি মেরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম—নৌকোর একটা ধারের দিকে। কিন্তু মা কিছুতেই এগুতে দেবে না। আমি ত' তখন সাঁতার জানি নে! আর সাঁতার জান্‌লেই বা কী! সেই ঢেউয়ের দোলালাগা নদী থেকে উঠে আসা আমার মতো ছোট ছেলের কাজ নয়। দু'বার নাকানি চুবানি খেলেই নদীর তলায় বরুণ দেবের রাজ্যে গিয়ে হাজির হতে হবে।

নদীপথে চলতে গিয়ে মাঝে মাঝে চরের দেখা পাওয়া যায়। এই হঠাৎ জেগে ওঠা চরগুলি দেখতে ভারী ভালো লাগে!

কোথাও সবুজের আস্তরণ, কোথাও বা শুধু বালি—কোথাও বা ওরই মাঝখানে গড়ে উঠেছে একটি ছোট্ট চাষী-পল্লী।

এক একটি চর বেশ লম্বা আর নিরালা।

এখানে মাঝে মাঝে কুমীর নদী থেকে উঠে এসে রোদ পোহায়। মাঝি বললে, অনেক সময় দল বেঁধেও ওরা উঠে আসে—মানুষের আর নৌকোর সাড়া পেলে ঝুপ্ ঝুপ্ করে জলে নেমে যায়। কচ্ছপের ডিমও মেলে এই সব চরে।

খাঁটি দুধ খাবে? ডাকো না একজন চাষার মেয়েকে। হাঁড়ি থেকে ঢেলে দেবে। এক ফোঁটা জল মেশানো নেই তাতে।

নৌকো করে দল বেঁধে মাছ ধরছে জেলেরা নদীর বুকে। জাল ফেলে দিয়েছে অগাধ জলে। এই রকম কত নৌকোর দেখা পেলাম আমরা।

ওদের কাছ থেকে টাটকা ইলিশ মাছ কিনে—গরম গরম মাছের ঝোল ভাত খেতে ভারী মজা!

সব কিছু ছাপিয়ে সব সময় নদীর কল্-কল্ ছল্-ছল্ শব্দ যেন মনের আর দেহের ময়লা ধুয়ে মুছে নির্ম্মল করে দিচ্ছে।

নদীর ওপর নৌকোর মাঝেই যেন আমাদের অসুখ অর্দ্ধেক সেরে গেল,—নতুন একটা বল যেন পেলাম!

ম্যাছরায় পৌঁছে যে নতুন খেলার সাথীগুলিকে পেলাম—তাতে আমাদের আনন্দের আর পরিসীমা রইল না।

বুলবুলি ভাইঝির মতো একটি মেয়ে আর কোথায় খুঁজে পাবো ? বয়সে আমার চাইতে কিছু বড়, কিন্তু তবু ত' আমি রাতারাতি কাকা হয়ে গেলাম! সে মজার দাম কি বড় সোজা? ভোলা ভাইপো··· সে-ও আমার কিছুটা বড়···তবু ত' ভাইপো···আমি তার কাকা! আর সব চাইতে খুসী হলাম কালুকে পেয়ে। ছোট্ট ছেলেটি···নাদুস নুদুস চেহারা···কতই বা তখন তার বয়স? সব সময় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে···আর আমাকে ডাকে নখিল কাকা বলে।

বুববুলি ভাইঝি সব সময় আমাদের খেলা দিতে ব্যস্ত। কত রকম খেলা আর আনন্দ তার মনের মধ্যে মৌচাক বেঁধে ছিল—তার হদিশ দেয়া শক্ত। তবে একটি দুঃখের কারণ ছিল—বুলবুলি ভাইঝির একটি হাত নুলো। কিন্তু তার জন্যে তাকে কোন দিন দুঃখু করতে শুনিনি, এক হাতেই সে একশ।

কেঠুদা ওখানে দিনরাত কাছারীর কাজেই ব্যস্ত। কিন্তু বৌ-ঠাকরুণ ব্যস্ত আমাদের নিয়ে! মুখে এতটুকু কথা নেই, নেই কোন অনুযোগ···হাসিমুখে সংসারটা কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আমরা ওখানে যাওয়ায় এতটুকু বিরক্ত নন, বরং আমাদের সুখ সুবিধার দিকে সকল সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে চারদিকে।

আমরা যে আলদা সংসারের মানুষ—হঠাৎ এখানে 'বেড়াতে' এসেছি—ওদের সকলের আন্তরিক মেলামেশায় আমরা দুদিনেই সে কথা একেবারে ভুলে গেলাম।

আরো একটি মানুষের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি এলেন আর কিছু দিন পর—কলেজের ছুটি হতে।

আমাদের অমিয় ভাইপোর কথা বলছি।

এমন সদাহাস্যময় আমুদে মানুষ আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে আলাপ হল—হো-হো করে হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞেস করলেন, ওরে—

ঘ্যানা বেড়ালের পাতুরী খাবি?

চামচিকের অম্বল?

শুনে ভারী মজা লাগল।

অদ্ভুত অদ্ভুত কথা চয়ন করে, মুখে মুখে এমন মজাদার ছড়া কাট্‌তে পারতেন যে অবাক হয়ে শুনতাম আমরা।

কলেজ ছুটির পর প্রথম যে দিন এলেন—টিনের তোরঙ্গ খুলে কয়েকটি খেলনা নিজের ভাই-বোনদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

বৌ-ঠাকরুণ ধমক দিয়ে উঠলেন ছেলেকে—হ্যাঁ রে অমিয়, ওর হাতে কিছু দিলি নে? তুই কি রকম মানুষ? আমার দেখিয়ে দিলেন তিনি। অমিয় ভাইপো একটু লজ্জা পেলেন। আসল কথা—তিনি জানতেন না যে, আমার এখানে এসেছি। তাই গুণতিতে খেলনা ত' কম পড়বেই।

তাড়াতড়ি এক মুঠো পাকা কুল তুলে নিয়ে আমার দু'হাত ভর্ত্তি করে দিলেন।

মহানন্দে আমি কুল খেতে লাগলাম।

বৌঠকরুণ যে অমিয় ভাইপোর সৎমা—সে কথা মা-ছেলে ত' ভুলেই গিয়েছিল, বোধ করি পাড়া প্রতিবেশীরও কারো মনে ছিল না।

এমন সৎ মা পাওয়া সত্যি ভাগ্যের কথা।

আমি নিজের চোখে দেখিছি বলেই আজ জোর করে সে কথা বলতে পারছি। আদর করতে, অভিমান করতে, ঝগড়া করতে অমিয় ভাই-পোর মা না হলে এক মূহুর্ত্তও চলে না।

আর যত ছেলেমেয়ে—সব ওর খেলার সাথী।

বড় হয়ে ওর আসল পরিচয়টা অনেক দিন পর জানতে পেরেছিলাম। অমিয় ভাইপো ছিলেন রাজসাহী কলেজের ছাত্রদের অন্যতম পাণ্ডা।

সেকালের একজন নামকরা এনার্কিষ্ট। সে সময় উত্তর-বঙ্গে যত স্বদেশী ডাকাতি হত তার সমস্ত প্ল্যান নাকি ছিল এঁর মাথায়। অথচ বাইরে থেকে এতটুকু বোঝাবার যো নেই। এঁর মুখে আমরা টাঙ্গাইলের ধীরেন ঘটকের নামও খুব শুনতাম।

আমার ম্যাছরার জীবনে এই অমিয় ভাইপো যে কী রকম মাতিয়ে রাখতেন—সে কথা আজকের দিনে ভাবলেও উল্লসিত হয়ে উঠি, কত কিছু ছায়াছবির মতো মনের পটে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়।

দল বেঁধে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, বনভোজনের আয়োজন করা, আবৃত্তি শেখানো···সব কিছু আমাদের প্রথম জীবনে পেয়েছি এই অমিয় ভাইপোর কাছ থেকে। আমরা ওঁকে ডাকতাম 'ভাইস্তা' বলে। সম্পর্কে আমি কাকা হলেও মাঝে মাঝে ভুল করে ওঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বসতাম। তার জন্যে অমিয় ভাইপোর কৌতুক আর উচ্চ হাসি আজও যেন শুনতে পাই।

ছোটদের সব অদ্ভুত অদ্ভুত বাৎ-চিৎ শেখাতেন। একটি ছেলে আর এক জনের ওপর ভারী চটে গেছে—সে কি করে তাকে গালাগাল দোবে?

—তুই পচা কাসুন্দী

—তুই কাঁঠালের কুঁইথা

—তুই নেংটি ইঁদুরের ল্যাজের ডগা

—তুই পচা মাছের গন্ধ

এমনি সব মজাদার বিশেষণে—একজন আর এক জনকে অভিষিক্ত করত। কিন্তু একটিও খারাপ কথা উল্লেখ করবার উপায় ছিল না—তার কাছে। ছেলেদের একেবারে যক্ষের মতো আগলে রাখতেন। তাঁর হয়ত মনে মনে এই বাসনা ছিল যে, বড় হয়ে এরা প্রত্যেকেই এক একটি অগ্নিকণা হয়ে উঠবে, ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার ব্রত গ্রহণ করবে।

এক দিনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। অমিয় ভাইপোর সঙ্গে আমরা কয়েকটি ছেলে বড় একটি নৌকা নিয়ে নদীতে বেড়াতে

গিয়েছি। মাঝিরা বাবুর আদেশ পেয়ে অনেক দূর চলে এসেছে। মাঝ নদীতে পড়ল এক চর।

অমিয় ভাইপো বললেন চল, এখানে সবাই নামি। এ রকম মজাদার প্রস্তাব পেলে ছেলেরা আর কিছু চায় না। নৌকোটাকে ভাল করে লাগতেও দেয় না তারা। ঝুপ্ ঝুপ্ করে লাফিয়ে নেমে পড়ে।

সারাটা চরে আমরা বেশ খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। অমিয় ভাইপো বললেন, তোদের মধ্যে কে ভারতবর্ষের ম্যাপ আঁকতে পারিস? আমরা তখন সবাই খুব ছোট; ম্যাপ আঁকার মুন্সীয়ানা কেউ আয়ত্ব করতে পারিনি। তাই এ-ওর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

অমিয় ভাইপো কোমরে কাপড় জড়িয়ে উত্তর দিলেন, ও! তোরা কেউ জানিস না বুঝি? আচ্ছা, আমিই তোদের সবাইকে ভারতবর্ষের ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিচ্ছি—

প্রথমে একটি কাঠি সংগ্রহ করা হল।

হাতে আঁকছেন আর মুখে সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন—

কত বড় আমাদের জন্মভূমি—বিদেশী লোকেরা এসে দখল করে আছে। ওদের সবাইকে তাড়িয়ে দিতে হবে এই দেশ থেকে।

তারপর দেখালেন—কোথায় কোন বড় শহর। একমাত্র কোল্‌কাতা ছাড়া আমরা তার নামই শুনিনি।

সকলের শেষে—বিরাট করে বালির ওপর লিখলেন—

ব—ন্দে—মা—ত—র—ম্!

তখনকার দিনে 'বন্দেমাতরম্' লেখা কিম্বা বলাটা ছিল নাকি মস্ত বড় অপরাধ।

'বন্দেমাতরম্' কথাটা লিখে অমিয় ভাইপো এমন মুখের অবস্থাটা করলেন যেন এক মুহূর্ত্তে একেবারে বিশ্বজয় করে ফেলেছেন।

তার সেই তৃপ্তির হাসিটি এখনো চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এই মানুষটির সঙ্গে যতই মিশতে লাগলাম—দেখলাম, একদিকে তিনি যেমন কঠোর, অন্যদিকে আবার তেমনি কোমল। আমাদের তখন

কতটুকুই বা বয়েস—রবীন্দ্রনাথের কবিতা বোঝা আমাদের জ্ঞানের আর সাধ্যের বাইরে। তবু অমিয় ভাইপো যখন রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তি করতেন—মনে হত যেন—সারা অঙ্গ ঘিরে একটা ইন্দ্রধনু উঠেছে—বুঝি বা না বুঝি, কবিতার ছন্দ মিল আর ভাব সব কিছু মিলে কেমন যেন দোলা দিচ্ছে।

বুঝতাম—একটা না-দেখা জগতের তোরণদ্বার খুলে যাচ্ছে, সেখানে সুর-ছন্দ-মিল মিতালি পাতিয়ে বাসা বেঁধেছে।

বড় হয়ে দেখেছি—অমিয় ভাইপো চমৎকার অভিনয়ও করতে পারেন। পেশাদারী মঞ্চের অভিনেতার চাইতে সে অভিনয় ছিল সম্পূর্ণ আর এক ধরণের।

মোট কথা ম্যাছরার দিনগুলি ভারী আনন্দে কাটতে লাগলো। বুলবুলি ভাইঝি আমাদের এমন করে ঘিরে রাখতো আর এমন মজার মজার খেলায় মাতিয়ে তুলতো যে, আজও সেই দিনগুলি মধু-স্বপ্ন রচনা করে! সেই হেসে খেলে আনন্দ করে বেড়ানোর দিনগুলি আর কোন দিনই খুঁজে পাবো না। সেতারে খুব একটি ভাল গৎ বাজানোর পর যেমন তার ধ্বনি মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরতে থাকে—তেমনি ছেলেবেলার সেই উজ্জ্বল পুলকের দিনগুলি রাশি রাশি হালকা মেঘের মতো আমার মনের আকাশে কখনো-সখনো উড়ে বেড়ায় লক্ষ্য-হীন ভাবে।

ম্যাছরা যায়গাটা তখনকার দিনে খুবই স্বাস্থ্যকর ছিল। অবশ্য আমাদের শরীর ভালো হওয়ার ব্যাপারে বৌ-ঠাকুরুণের সজাগ দৃষ্টি অনেকখানি সাহায্য করছিল। তার ওপর ছিল মনের মতো খেলার সাথী। কালুটা সব সময় অনুগত বাহনের মতো আমার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াত।

তারপর উৎসব সুরু হয়ে যেত যখন নাকি কোন ছুটিতে রাজসাহী কলেজ থেকে অমিয় ভাইপো এসে হাজির হত।

তার পুঁটলিতে থাকতো রঙ-বেরঙের খেলনা আর রাশি রাশি ফল। আর মানুষটি তার মনে যে মধু সঞ্চয় করে নিয়ে আসতো—

তা ত' আর বাইরে থেকে দেখা যায় না। সারা ছুটিটা ধরে আমরা আবার সবাই মিলে সেই মধু আহরণ করতাম। ভাণ্ডার আমাদের পূর্ণ হয়ে যেতো।

ম্যাছরার একটা মজার ঘটনার কথা বলি—

একদিন বিকেলের দিকে আমরা ছু' ভাই বাসায় কি একটা হুষ্টুমী করে পালিয়ে এসেছিলাম। আমাদের ধারণা হয়েছিল—বাসায় ফিরলেই বেশ উত্তম-মধ্যম খেতে হবে।

যখন আমরা আর সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলায় মেতে ছিলাম, নিজেদের অপরাধের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। খেলা যখন ভেঙে গেল—তখন নতুন করে মনে পড়ল নিজেদের হুষ্টুমীর কথা! তাই ত! এখন কি করে অন্দর মহলে ফেরা যায়?

দোষী মন বেশী করে ভয় পায়।

আসলে বাড়ীর সবাই হয়ত আমাদের দোষের কথা বেমালুম ভুলেই গেছে। কিন্তু আমরা সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি নে।

বাড়ীর বাইরের দিকে একটা ঘর ছিল। তার সাম্নে সুদূরপ্রসারী মাঠ। মাঠের দিকে সেই ঘরের একটা মাটির বারান্দা ছিল।

চুপচাপ আমরা ছুটী ভাই সেখানে গিয়ে বসলাম।

তখন সন্ধ্যা বেশ ঘনিয়ে এসেছে।

নীরবে আমরা ছুটি ভাই পাশাপাশি বসে। মুখে কোন কথা নেই! আকাশে তাকিয়ে দেখি, দল বেঁধে নানারকম পাখী আর বাহুড়ের দল উড়ে যাচ্ছে। পাখীরা নিশ্চয়ই নিজেদের বাসায় ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের আজ বাসায় ফেরার উপায় নেই!

সারারাত এইখানে বসে থাকতে হবে কিনা কে জানে? গোটা আকাশ আর পৃথিবীর গায় কে যেন কালির পোঁছ দিয়ে দিচ্ছে।

রাশি রাশি তারা দূর গগন থেকে চোখ মিটমিট্ করে এই ছুটি হুষ্ট ছেলের কাণ্ড দেখে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

দূরে কোন ঝোপের আড়াল থেকে শেয়াল ডেকে উঠল—হুক্কা হুয়া—হুক্কা হুয়া—হুক্কা হুয়া—।

আমি ভয় পেয়ে দাদার কাছে আরো ঘেঁসে বস্‌লাম। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কি হবে ?

দাদা জবাব দিলে, চুপ করে বসে থাক না—

রাত্রি তার কালো ওড়না আরো নিবিড় করে ছড়িয়ে দিলে।

যে গাছগুলো দিনের বেলায় শুধু গাছই ছিল—এখন মনে হল তারা ব্রহ্মদৈত্যি ছাড়া আর কিছু নয়—! অন্ধকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে আছে···যে কোন মুহূর্ত্তে ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়তে পারে !

আবার ও কি !

দূরে মাঠের বুকে তাকিয়ে দেখি, কয়েকটা আলো এদিক-সেদিক এখানে-ওখানে লাফাচ্ছে। কখনো খুব দূরে জ্বলছে—কখনো আবার কাছে।

বুকের ভেতরটা কেমন যেন হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল। নিশ্চয়ই ওরা স্কন্ধকাটা আর দৈত্যি-দানার দল। অন্ধকার রাত্তিরে নির্জ্জন মাঠে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে! যখন আমাদের সন্ধান পাবে—কিছুতেই আর আস্তো রাখবে না !

হায় ! হায় ! কি কুক্ষণেই দুষ্টমী করতে গিয়েছিলাম ? এখন যদি কেউ পিঠে দমাদ্দম কীল মেরে হিড়হিড় করে ঘরে টেনে নিয়ে যায়—তবে প্রাণ ফিরে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি !

দূর ছাই ! তবু কি কেউ আসে !

সেই ভূতুড়ে আলো গুলোর নাচ দেখতে দেখতে সমস্ত দেহ-মন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল !

এমন সময় কোন গাছের আড়াল থেকে একটা পাখী বিদ্‌ঘুটে আওয়াজে ডেকে উঠল—ভূত-ভূতুম্‌—ভূত !

মনে হল সারা গা একেবারে হিম শীতল হয়ে গেছে। কে যেন বরফ-জল ঢেলে দিয়েছে মাথার ওপর।

হয়ত আর কিছুক্ষণ এইভাবে থাক্‌লে অজ্ঞানই হয়ে যেতাম। এইবার বাড়ীর ভেতর থেকে সত্যি আমাদের ডাক পড়ল। আর কে যেন এসে আমাদের ধরে নিয়ে গেল।

তখন সত্যি বাঁচলাম। এই ধরাটা আগে ধরলে কি ক্ষতি ছিল বাপু!

আরো বড় হয়ে অবশ্য জানতে পেরেছিলাম যে, মাঠের ওই ভূতুড়ে আলোগুলো 'আলেয়া' ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু সেদিন সেই ভয়াবহ সন্ধ্যায় ভূতের নৃত্যটাই আমার কাছে সত্যি হয়ে উঠেছিল!

ম্যাছরায় প্রথম দিকে যেমন আনন্দ করে কাটিয়েছি—শেষের দিকে আমি ঠিক তার চতুর্গুণ অসুখে ভুগেছি।

লোকে কথায় বলে—যমের দক্ষিণ দুয়ার।

আমি দারুণ রোগে ভুগে একেবারে যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখে এসেছি। আমাশায় এমন কাতর হয়ে পড়েছিলাম যে, বাঁচবার কোন আশাই আর ছিল না। কতবার যে পায়খানার বেগ হত—সে কথা বলাই শক্ত। থাক-থাক করে খবরের কাগজ শিয়রে ভাজ করে কাটা থাকতো। একবার গিয়ে বিছানায় ওঠবার অবকাশ পেতাম না। তক্ষুণি আবার ছুটতে হত। বস্‌তে পারতাম না ভালো করে, এমনি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলাম। এক এক সময় বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যেতাম।

সবাই আমার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিল।

মার ত' দিনে-রাত্তিরে একেবারে ঘুম ছিল না। আমার শুশ্রূষা করতে গিয়ে তাঁর শরীরও অর্দ্ধেক হয়ে গিয়েছিল।

সে সময় যে কষ্ট আর যাতনা ভোগ করেছিলাম—তা আজও ভুলতে পারিনি। এর পর বাতে এমন কাবু হয়ে পড়লাম যে, আমার দেহে হাত ছোয়াবার যো ছিল না। ইলেকট্রিক স্পার্ক দিলে যে যন্ত্রণা হয়···আমারও ঠিক সেই অবস্থা হয়েছিল।

বিছানায় পাশ পর্য্যন্ত ফিরতে পারতাম না। অথচ মা যখন ধরে ধরে আমায় পাশ ফিরিয়ে দিতেন, মনে হত ব্যথায় আমি একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছি। তুলোর ভেতর আঙুর ফল যেমন

সাবধানে রাখতে হয়—আমার দেহটাকে ঠিক তেমনি করে নাড়াচাড়া করতে হত।

এক-এক সময় মনে হত আর বুঝি কখনো ভালো হবো না। বিছানা থেকে উঠতে পারবো না, বাইরে যেতে পারবো না। কারো সঙ্গে ছুটোছুটি করে খেলাধূলা করতে পারবো না। সারাটা জীবন বুঝি আমার এমনিই যাবে!

থেকে থেকে এক-এক সময় কি যে অসহ্য মনে হত···সে-কথা লিখে বোঝাতে পারবো না।

এমনি অবস্থা হলেই বুঝি মানুষের আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু তখন আমি খুবই ছোট ছিলাম বলে আত্মহত্যার ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম না। তবু মনে মনে ভারী ভয় হত, কি করে এমনি ভাবে দিন কাটাবো!

এই সময় দাদা আমার উপর ভারী উদার হয়ে উঠেছিল। তার যে খেলনাগুলি সে অন্য সময় অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করত এবং আমাকে হাত পর্য্যন্ত দিতে দিত না—আমার এই দারুণ অসুখের সময় অবলীলাক্রমে সেগুলি আমাকে দান করে দিয়েছিল।

এত যন্ত্রণার মধ্যেও দাদার এই 'অবিশ্বাস্য দান' সত্যি আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

মানুষ মাত্রেই এক এক সময় মরণাপন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়—আবার ভালও হয়ে যায়।

আমার এই সাজ্ঘাতিক অসুখের ব্যাপারে মার একটি অদ্ভুত ধারণা হয়েছিল। কেন আমি অমন শক্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলাম সে সম্পর্কে আমার মার যে বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল হয়েছিল সেই কথাই বলি।—

একদিন নাকি মা ওখানে শিবপূজায় বসেছিলেন। কি একটা ব্যাপারে দাদা আমাকে দারুণ তাড়া করেছিল। সেই তাড়া খেয়ে আমি ছুটে গিয়ে শিবলিঙ্গের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম, আর তার পরেই নাকি আমি মরণাপন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হই। আমার

মা অন্য এক আত্মীয়ার কাছে বলেছিলেন—এই নাকি আমার রোগের সূচনা।

মা যে-যুগের মানুষ—তাঁর পক্ষে এই রকম একটা ভেবে নেয়া এবং বিচলিত হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। তবে এ-কথা নিশ্চয় যে, সে-বার আমি মরতে মরতে কোন গতিকে বেঁচে উঠেছিলাম—হয় ত নেহাৎ আমার আয়ু ছিল বলেই। মায়ের সেবা-মূর্ত্তি এখনো স্মরণে জাগে!

আরো বড় হয়ে আর একবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলাম—দেখেছিলাম তার ভয়াল মুখখানি। সেই কথাই এই ফাঁকে মনে পড়ছে।

তখন আমি পুরীতে ভিক্টোরিয়া হোটেলের কাছে "ওসেনিয়া" নামে একটি বাড়ীতে আছি। একটি বিরাট দল জুটে গেছে আমাদের। প্রতিদিন দু-তিন ঘণ্টা সাঁতার কাটি সমুদ্রে। সেদিনও দল বেঁধে এগিয়ে চলেছি। অনেক দূরে একটি চর পড়েছিল। সেইখানে গিয়ে আমরা উঠবো—এই ছিল আমাদের সঙ্কল্প।

মাঝ পথে কতকগুলি ব্রেকারের ধাক্কায় আমি প্রচুর নোনাজল খেয়ে ফেললাম। দম আটকে এলো, মনে হল দেহ আর হাত-পা শিথিল হয়ে আসছে। আর বুঝি ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝতে পারবো না। চক্ষে অন্ধকার দেখলাম। বুঝলাম—আর দেরী নেই—এইবার আমি সাগরের বুকে হারিয়ে যাবো—তলিয়ে যাবো!

মৃত্যু যেন হাতছানি দিয়ে ডাকলো। বুঝলাম—তার আহ্বান উপেক্ষা করার মতো বিন্দুমাত্র শক্তি আমার দেহে নেই।

সেই মুহূর্ত্তে আমি আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হলাম। ঠিক এই সময়—জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দুটি বলিষ্ঠ হস্ত এগিয়ে এলো। সে হাত আমাদের দলেরই বন্ধু শান্তি সোমের।

শান্তি সোম আমাকে—সেই চরের নিরাপদ আশ্রয়ে অবলীলাক্রমে পৌঁছে দিয়ে জীবন রক্ষা করলেন। এই শান্তি সোম হচ্ছেন লেখিকা প্রতিভা বসুর কাকা।

আবার সেই ম্যাছরার কাহিনীতে ফিরে যাচ্ছি। কি করে আমি সেবার জীবন ফিরে পেয়েছিলাম—সে কাহিনী বাড়ীর লোকের কাছে সত্যি আশ্চর্য্যজনক ও রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল।

নতুন জীবন নিয়ে কিভাবে আমি মায়ের সঙ্গে আবার গ্রামে ফিরে এলাম—সে কথা সত্যি কথা বল্‌তে কি মনে নেই।

আমার পূর্ব্বেকার স্বাস্থ্য ফিরে পেতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল।

ছেলেবেলায় মামাবাড়ীতে একটা বড় চুরি হয়েছিল।

একদিন গভীর রাত্রে মামার লাঠি ঠোকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি মামা সারা ঘরময় ব্যস্তভাবে লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোনটা আগে করবেন ঠিক ঠাহর করতে পারছেন না! তারপর শক্ত করে একটা মালকোঁচা মেরে নিলেন। আবার আর এক পাক ঘুরে নিয়ে মাথায় চাদর দিয়ে একটা পাগ্‌ড়ি তৈরী করে ফেল্লেন। তারপর লাঠিটা ডান হাতে বাগিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

শুন্‌লাম মামাবাড়ীর এজমালি দালান থেকে দারুণ চুরি হয়ে গেছে। ওখানে রাত্তিরে যে পাহারায় থাক্‌তো তার নাম দাগু। ব্যাপারটাকে চুরি না বলে ডাকাতি বলাও চলে।

ডাকাতের দল এসে দাগুদাকে নাকি ভয় দেখায়।—যদি টু শব্দ করিস তবে প্রাণে একেবারে মেরে ফেল্‌বো।

বুড়ো মানুষ দাগুদা—ভয়ে কেঁচো হয়ে চুপ্‌চাপ থাকে। ডাকাতদল তখন ওর হাত-পা বেঁধে ফেলে। তারপর দালানের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে বহু জিনিস-পত্তর-বাসন-কোসন নিয়ে পালিয়ে যায়।

এর পর যার পাহারা দেবার পালা সে নাকি হাঁক দিতে দিতে আস্‌ছিল—! দালানের দরজা অত রাত্তিরে খোলা আর বাঁধা অবস্থায় দাগুদাকে দেখে—তার চক্ষু ত' চড়কগাছ!

প্রথমটা ওর মুখ দিয়ে কথা বেরুতে চায় না!

তারপর দাগুর ইঙ্গিত পেয়ে ওর বাঁধন-ছাঁদন খুলে দেয়। লোকটা

তারপর বুদ্ধি করে ছুটে এসে কর্ত্তাদের এই ডাকাতির খবর দিয়ে জাগিয়ে তোলে।

মামা ত' হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন—তারপর আমার আর চোখে ঘুম নেই!

কত রকম চিন্তার ঢেউ মাথায় এসে আঘাত করতে লাগ্‌ল। ডাকাতগুলো দেখ্‌তে কেমন?

নিশ্চয়ই দৈত্যি-দানবের মতো বিরাট আর বিকট চেহারা। কালো আর ইয়া লম্বা! মাথায় শিং—মূলোর মত সাদা-সাদা বড়-বড় দাঁত।

তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কি মামা জিত্‌তে পারবেন? সঙ্গে ঢাল-তরোয়াল, অস্ত্র-শস্ত্র ত' কিছুই নেই! কটা লোকই বা মামার সঙ্গে আছে? দাগুদা ত' বুড়ো মানুষ! দানবের মতো ডাকাতদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন কেন?

এই সব কথা ভেবে ভেবে আমি বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে লাগ্‌লাম। ঘুম আমার চোখের পাতা থেকে ছুটি নিয়ে পালিয়ে গেল!

ভয়ে মাকেও সব কথা জিজ্ঞেস করতে পারিনে! কি জানি যদি ডাকাতেরা শুনতে পেয়ে আমাকে শুদ্ধু ধরে নিয়ে যায়? যতক্ষণ পর্য্যন্ত মামা ফিরে না আসেন আমি ঘুমোই কি করে?

বাইরে থম্‌ থমে রাত্তির—একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডেকে চলেছে। কৈ? যুদ্ধ যে হচ্ছে—তার কোনো শব্দ ত' শুন্‌তে পাচ্ছিনে!

নানা কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে শেষ রাত্তিরের দিকে ঝির ঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জান্‌তেও পারিনি।

যখন ঘুম ভাঙ্‌ল বেশ রদ্দুর উঠে গেছে।

উঠেই—খাওয়ার দিকের মন নেই!

জিজ্ঞেস করলাম—মামা কৈ? ডাকাত দলই বা কোথায়?

খবর নিয়ে জানা গেল—ডাকাত দল কাল রাত্রেই পালিয়েছে—তাদের ধরা যায়নি। থানায় খবর দেয়া হয়েছিল। পুলিশের লোক

দারেগা সহ আজ খুব সকালেই এসে হাজির হয়েছে। উত্তর দিকের মাঠ দিয়ে ডাকাত দল পালিয়েছে। পুলিশের লোক সেই দিকেই গেছে। বাড়ীর ব্যাটা ছেলেরাও নাকি সবাই উত্তর দিকের মাঠে গিয়ে হাজির হয়েছে।

এই রকম একটা চাঞ্চল্যকর খবর পেয়ে কেউ চুপ্‌চাপ ঘরে বসে থাক্‌তে পারে? সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে আমিও কাউকে কিছু না জানিয়ে পুকুরের ধার দিয়ে উত্তর দিকের মাঠের দিকে রওনা হলাম। বহু লোক খবর পেয়ে সেই দিকে যাচ্ছিল। আমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চল্লাম।

পথের সন্ধান নেবার আর কোনো প্রয়োজনই তখন হয় নি।

পূব বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে এটা ও অঞ্চলে একটা মস্ত বড় খবর। ইতি মধ্যেই সেই সংবাদটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই কৌতূহলী জনতার অভাব হয় নি!

আমি পথ চল্‌ছি আর মনে মনে ভাব্‌ছি—পুলিশের লোক যখন এসে পড়েছে তখন ডাকাত দল নিশ্চয়ই ধরা পড়বে। এইবার বাছাধন-দের আজ রক্ষা নেই। পুলিশদের সঙ্গে ত' বন্দুক থাকে। কাজেই দরকার হলে ওরা বন্দুক ছুঁড়ে ডাকাতদের মেরে ফেল্‌তেও পারে! ডাকাতগুলো দেখ্‌তে কেমন—দিনের বেলায় ভালো করে সামনা-সামনি চোখ মেলে দেখা যাবে!

এমন একটা সাজ্ঘাতিক কাণ্ড না দেখে কি থাকা যায়? কেন আরো ভোরে ঘুম ভাঙেনি—কেন কেউ আমায় জাগিয়ে দেয় নি—এই সব কথা ভেবে ভারী আফশোষ হচ্ছিল।

যাই হোক, অনেকগুলি চাষা-ভূষো লোকের সঙ্গে ক্ষেতের আল ধরে হাঁট্‌তে সুরু করে দিলাম। মাঠে তখন কোনো ফসল ছিলনা। শক্ত মাটির ওপর লাঙ্গল চালিয়ে মাটি গুড়ো গুড়ো করে রাখা হয়েছিল, সেইগুলি পায়ের তলায় বেশ বিঁধছিল। কিন্তু তবু আমাকে ছুটে যেতেই হবে ওদের সঙ্গে। নইলে যদি পথ হারিয়ে ফেলি?

একা একা বাড়ীর বার ত' কখনো হই নি! এই প্রথম। বাড়ীর

লোকে ভালো করে জানেও না যে, আমি ফুড়ুৎ করে কোন্ ফাঁকে পালিয়ে এসেছি!

একটি কৃষক আমায় আঙুল দিয়ে দেখালে, ওই যে দূরে পুলিশের লোক সোলার টুপি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ওইখানে ডাকাতরা জিনিষপত্র ফেলে পালিয়ে গেছে। শীগ্‌গির পা চালিয়ে চলো—

ডাকাতরা জিনিসপত্র ফেলে গেছে? কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! চলো—চলো—দেখতে হবে।

আবার ছুট্ লাগালাম ওদের সঙ্গে—!

ওখানে পৌঁছে দেখি মামাবাড়ীর অনেকেই সেখানে হাজির হয়েছেন। হাফ্‌প্যাণ্ট আর সোলার টুপি পরা দারোগা সব কিছু তদন্ত করছেন। কতকগুলি ট্রাঙ্ক আর বাক্স ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে! অনেক জিনিসপত্তর চারদিকে ছড়ানো!

পুলিশের লোকদের চেহারা দেখে আমার ভক্তি কিন্তু কর্পূরের মতো একেবারে উপে গেল!

এরাই সব ধরবে—দানবের মতো ডাকাতদের! তবেই হয়েছে!

আশে-পাশে যে সব কৃষকদের বাড়ী ছিল—তাদের ডেকেও জিজ্ঞেস করা হল—এই ডাকাতি সম্পর্কে তারা কিছু জানে কিনা?

পুলিশের কাণ্ড দেখে আমি কিন্তু মোটেই খুশী হলাম না! এইসব সরল, নিরীহ চাষারা দুর্দ্দান্ত ডাকাতদের সন্ধান রাখ্‌বে কি করে? ডাকাতরা যখন এসেছিল তখন এরা আমাদেরই মতো হয়ত নিজের নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল!

তার চাইতে পুলিশের লোকেরা যদি বড় বড় তেজী ঘোড়ায় চেপে, বন্দুক হাতে নিয়ে রে-রে শব্দে ডাকাতদের পেছনে ধাওয়া করত তবে হয়ত কিছুক্ষণ বাদে ওদের দেখা পেত আর যুদ্ধ করে সবাইকে কেটে ফেল্‌তে পারত! তা না করে পুলিশের লোকেরা যে কেন এখানে মিছিমিছি সময় নষ্ট করছে সে কথা আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না! রাগে আমার নিজের হাত-পা কাম্‌ড়াতে ইচ্ছে করছিল!

এতক্ষণ সেই দুর্দ্দান্ত ডাকাতদল কত পথ পেরিয়ে, কত নদী সাঁত্‌রে, কত পাহাড় ডিঙিয়ে—দূরে—আরো দূরে চলে যাচ্ছে তা কি এরা কিছুই বুঝ্‌তে পারছে না ?

আমি বল্লে কি আমার কথা ওরা কেউ শুনবে ? হয়ত সবাই মিলে হো-হো করে হেসে উঠ্‌বে।

রদ্দ্‌র বেড়ে যাচ্ছিল।

একে একে সবাই বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে।

কিন্তু আমার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নেই!

পুলিশের দল যে অকারণ সময় নষ্ট করছে—ডাকাতদের পাক্‌ড়াও করবার জন্যে কোনো চেষ্টাই করছে না—এই ব্যাপারটা আমার মনে কাঁটা হয়ে বিঁধ্‌তে লাগ্‌লো।

কি ভাবে ওদের সচেতন করে তুল্‌ব সেই কথাই ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। ডাকাতরা যেসব বড় বড় ট্রাঙ্ক মাঠের মাঝখানে ভেঙে ফেলেছে—সেইগুলি দেখতে লাগ্‌লাম।

ওদের গায়ে নিশ্চয়ই খুব জোর—নইলে কি করে এই ট্রাঙ্কগুলো হাত দিয়ে মোচড় দিয়ে ভেঙেছে ? ওদের কাছে যে নানারকম যন্ত্র থাকে সে কথা তখন আমার আদৌ মনে হয় নি। শুধু ডাকাতদের গায়ের জোরের কথাই ভেবেছি।

হঠাৎ আবার মাথা তুলে তাকিয়ে দেখি—কোন ফাঁকে মামাবাড়ীর সবাই চলে এসেছে। পুলিশের লোকজনও বোধ করি থানার দিকে চলে গেছে। কয়েকটি চাষা এদিক-ওদিক রয়েছে। কেউ কেউ নিজ-নিজ ঘরের দিকে পা চালিয়ে দিয়েছে।

আমি তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা পূব বাড়ীর দিকে কে যাবে ?

ওরা জবাব দিলে, ওদিকে ত' আমরা কেউ যাবো না—আমরা কাম্‌লা খাট্‌তে যাচ্ছি—

কিছুদূর এসে তারা অন্য পথ ধরলে।

কাজেই বাধ্য হয়ে আমাকে একা-একাই রওনা হতে হল।

মাঠের আল ধরে, ছায়াশীতল গাছের তলা দিয়ে চলে এলাম—একটি নির্জ্জন পাড়ার পায়ে-চলা পথে।

যখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম—তখন সঙ্গে ছিল চাষীর দল—রাস্তার ভাবনা তারা ভেবেছে—আমি শুধু মহা আগ্রহ নিয়ে ছুটে-ছুটে পথ চলেছি।

এখন আমি একা পথিক।

পায়ে-চলা-পথ গেছে এঁকে-বেঁকে—তাই যেদিক দিয়েই বেরুতে যাই—আসল পথ আর খুঁজে পাই নে।

তখন বুঝতে পারলাম, আমি হারিয়ে গেছি!

যত বেশী রাস্তা চেন্‌বার চেষ্টা করি—তত গুলিয়ে যায়!

একজন-দুজন ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, পূ ব বাড়ী যাবো কোন পথে।

ওরা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌ল।

কোনো জবাব দিতে পারল না।

এলো-পাথাড়ি আরো কিছুক্ষণ পথ চেন্‌বার ব্যর্থ চেষ্টা করে যখন কোনো হদিশই পেলাম না—তখন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে একেবারে ভঁ্যা করে কেঁদে ফেল্লাম!

এই আমার প্রথম পথ হারানো!

তাই কি করে বাড়ী ফিরে যাবো—আর ফিরে গিয়ে মার খাবো কিনা সে ভয়ও ইতিমধ্যে মগজে বাসা বেঁধেছিল।

একজন দু'জন করে কৃষক-বৌরা এসে আমাকে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগ্‌লো আমি কোন বাড়ীর ছেলে!

হঠাৎ, তারই মধ্যে একজন আমায় চিন্‌তে পারলে। বল্লে—ও! এ ত পূব-বাড়ীর মেজ তরফের ছেলে! চল, চল, আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি—

তখন কাঁদতে কাঁদতে তারই হাত ধরে এগুতে লাগ্‌লাম। মনে ভয়ও আছে—ছেলে ধরা নয় ত? আমাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবে ত?

যখন মামা বাড়ীর পুকুরের ধারে এসে পৌঁছেচি—তখন সত্যি ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো।

ওদিক থেকে কে আস্‌ছে না? এ যে আমার দাদি মাসি! দাদি মাসি আমায় খোঁজেই যাচ্ছিল!

ছুটে গিয়ে দাদি মাসিকে আঁকড়ে ধরলাম।

সেই যে কে বলেছিল, আমি তোমায় নুনের মতো ভালবাসি—! নুন যে কত মিষ্টি সেটা ঠেকায় না পড়লে জানা যায় না!

দাদি মাসি যে কত আপনার মানুষ সেদিন প্রাণে-প্রাণে বুঝ্‌তে পেরেছিলাম!

সেদিন বাড়ীতে ধমকের ওপর দিয়েই শাসন শেষ হয়েছিল। পিঠে আর ভাদ্রের তাল পড়ে নি!

আমার আগাম কান্নাই বোধ হয় বড়দের শাসনকে সংযত করেছিল!

এই ঘটনার দিন কয়েক বাদে পুলিশ যখন গোটা কয়েক লোককে হাত কড়া লাগিয়ে মামাবাড়ীতে এনে হাজির করল—তখন তাদের চেহারা দেখে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।

এরাই তা হলে ডাকাত!

কোথায় ইয়া লম্বা দানবের মতো চেহারা, মূলোর মতো দাঁত, মাথায় শিং···এরা যে নেহাৎই মানুষ!

এমন আশা ভঙ্গের ব্যাপার যে ঘট্‌বে সে কথা কে ভেবে রেখেছিল!

মনে মনে যা কল্পনা করা যায়—তার কিছুই কি শেষ পর্য্যন্ত ফলে না!

অন্ততঃ একটি ছোট ছেলেকে খুশী করার জন্যে ত' কোনো কোনো বাস্তব ব্যাপারে কল্পনার খাদ মেশা প্রয়োজন!

আমরা কয়েকটি ছেলে মামাবাড়ীর পুকুরে একসঙ্গে সাঁতার কাটা শিখেছিলাম।

আমাদের সাঁতার শেখানোর শিক্ষক ছিল কুইনা মামা। বড়মামার বড় ছেলে বড়দা বোধকরি আগেই সাঁতার শিখেছিলেন। তাঁর ছোট ভাই আমাদের বদনদা, দাদা, ছোক্কন, আমি সবাই বোধকরি এক সঙ্গেই সাঁতার শিখেছিলাম।

কলাগাছ কেটে কুইনা মামা কতকগুলি সুন্দর ভেলা তৈরী করেছিল। এগুলো অবশ্য সতী বেহুলার লখিন্দরকে নিয়ে স্বর্গরাজ্যে যাওয়ার ভেলা নয়,—কিন্তু এই মর জগতেই সাঁতার শেখার কাজে এগুলি ছিল আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

এই ভেলা ধরে আমরা খুব করে পা দাপাদাপি করতাম। তারই ফলে ঘাটের জল ঘোলা হয়ে উঠ্‌ত। কার সাধ্যি সে সময় পুকুরে এসে স্নান করে!

যে সব বুড়িদের ছুঁচিবাই ছিল তাঁরা ত ক্রমাগত আমাদের গালাগাল করতে থাক্‌তো! কিন্তু সেদিকে কান দেবার মতো সময় ও ধৈর্য্য আমাদের আদপেই ছিল না!

পা দাপাদাপি করে যখন জলের ওপর ভেসে থাক্‌বার খানিকটা অভ্যাস হল—তখন কুইনা মামা আমাদের একটু দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিত! আমরা ভীষণ হাত-পা ছুঁড়ে—দাপাদাপি করে, জল খেয়ে পারের দিকে চলে আস্‌তাম।

কুইনা মামা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ত, এই রকম করেই আস্তে আস্তে হবে। তখন আর আমাদের কলাগাছের ভেলা ছুঁতে দেয়া হত না!

মাঝে মাঝে আমরা কলসীকে উপুড় করে তারই সাহায্য নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে চলে যেতাম! অবশ্য বেশী দূরে যাওয়া একেবারে নিষেধ ছিল।

প্রথম যেদিন ভেলা আর কলসীকে বাদ দিয়ে বেশ খানিকটা সাঁত্‌রে এলাম—সেদিন আনন্দ দেখে কে!

সাঁতার শিখে গেছি···এ কী কম গৌরবের কথা?

একদিন ত' বেশী উৎসাহে একটু দূরে গিয়ে, হাঁপিয়ে পড়ে, জল খেয়ে আর ফিরে আস্‌তে পারি না।

তখন কুইনা মামা সাঁতরে গিয়ে টেনে নিয়ে আসে। বলে,—প্রথমেই এতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়। ধীরে ধীরে এগুতে হবে।

শেষকালে আমি একেবারে জলের পোকা হয়ে উঠ্লাম। আমাদের ছা'মাসীও এই ফাঁকে সাঁতার শিখে নিয়েছিল।

আরো একটু ওস্তাদ হয়ে আমরা সবাই মিলে সাঁতারের প্রতিযোগিতা করতাম!—কে আগে এগিয়ে যেতে পারে!

এমন দিনও গেছে যে ক্রমাগত দু' ঘণ্টা ধরে পুকুরে সাঁতার কেটেছি—হাতের চামড়া কুঁচকে গেছে, চোখগুলি হয়েছে রাঙা! শেষ কালে গালাগালি দিয়ে, মারের ভয় দেখিয়ে আমাদের জল থেকে টেনে তুলতে হত।

হয় ত তার পরেই হুঁ-হুঁ কাঁপুনিতে ম্যালেরিয়া জ্বর! তবু সেই সব উচ্ছল আনন্দের দিনগুলি মনের মণি-কোঠায় অক্ষয় হয়ে আছে।

হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল—আমাদের মুন্সীবাড়ীতে কলের গান এসেছে! সারা গাঁয়ের লোক সেখানে হুম্ড়ি খেয়ে পড়েছে।

সেই সময় মামাবাড়ীতে কড়া হুকুম ছিল—আমরা কিছুতেই নিজেদের বাড়ী যেতে পারবো না! ওখানে থিয়েটারের মজ্লিশ, তাসের আড্ডা, সব সময় নানা গল্প-গুজবের আসর—সেই জন্য আমাদের ওদিকে পা বাড়ানো ছিল একেবারে বারণ!

পাছে আমরা দলে ভিড়ে খারাপ হয়ে যাই! কিন্তু কলের গান এসেছে—সেটা কি করে না দেখ্লে চলে?

সেই কলের ভেতরে বসে নাকি কয়েকটা লোক গান গায়। বাক্সের সঙ্গে লাগানো আছে এক বিরাট চোঙ্। ঘন-ঘন চাবি দিলেই ভেতর কার মানুষ গান গাইতে সুরু করে দেয়।

কি করে মানুষগুলোকে অতটুকু বাক্সের মধ্যে পুরে রাখা হয়েছে—সেটা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

দিদিমাকে গিয়ে ধরলাম—বাড়ী গিয়ে কলের গান শুনবো। বাড়ী মানে—মুন্সীবাড়ী।

প্রথমে ত একেবারে না! তারপর অনেক সাধ্য-সাধনা আর মান-অভিমানের পর অনুমতি মিল্‌লো!

কি মজা! তা হলে সত্যি কলের গান শুন্‌তে পাবো? তখন একেবারে লাফাতে সুরু করলাম!

মামাবাড়ী থেকে বাড়ীতে যাওয়া সত্যি একটি অঘটন ব্যাপার! আমাদের বাড়ীতে যাঁরা আছেন তাঁরা আশাই করতে পারেন নি যে, আমরা দু ভাই কলের গান শুন্‌তে ওখানে যাবার অনুমতি পাবো।

আমাদের মুন্সী বাড়ীর সত্যি কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল। সেগুলি অতি ছোটবেলা থেকেই আমার মনকে আকর্ষণ করত।

মুন্সীবাড়ীতে ঢুক্‌তে প্রথমেই পড়ে নহবৎখানা। এখানে আগেকার আমলে নহবৎ ছিল। বাঁধানো ভিটে পড়ে আছে, কিন্তু নহবৎ নেই! রোজ সকালে-বিকেলে নহবৎ বাজ্‌তো। তাই এই অঙ্গনটার নাম হয়েছে নহবৎ খানা। নহবৎ খানার দুই দিকে দুই ধোপাবাড়ী। এরা মুন্সী বাড়ীর চাকরাণ! জমি, বাড়ী পেয়েছে। তাই এই বাড়ীর কাপড় কেঁচে দিতে হয়। এ ব্যবস্থা সাবেকী আমলের।

ওদিকে পূবদিকে বারোয়ারী কালীবাড়ী। এখানে বছরে একবার খুব ধুমধাম করে পূজো হয়—মেলা বসে, যাত্রা হয়। এ ছাড়া নিত্য পূজোরও ব্যবস্থা আছে।

নহবৎ খানার পরে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। গ্রামের মেয়েরা এইখানে পড়াশুনা করত!

আরো ভেতরে ঢুক্‌লে বাঁ দিকে পড়ে বিরাট পুকুর আর তারই পাশে বহু পুরোণো শিবের মন্দির। সাম্‌নে সিদ্ধিদাতা গণেশের চমৎকার খোদাই করা মূর্ত্তি। কোন সালে শিব মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল—তার সন তারিখ মন্দিরের গায়ে খোদাই করা আছে। দেড়শ বছরের কম নয়। আমাদের বাড়ীর চারটে তরফ্‌। বড় তরফ্‌, মেজ তরফ্‌, রাঙা তরফ্‌ আর ছোট তরফ্‌। পালাক্রমে পূজো-পার্ব্বণ চলে আর শিব মন্দিরেরও নিত্য পুজো হয়।

এর পর ডানদিকে মোড় ঘুরলে যে চত্বরটি পড়ে সেখানে মুন্সী

বাড়ীর বাঁধা ষ্টেজ। এখানে বারোমাসে তের পার্ব্বণ লেগেই আছে। কত নাটক যে এখানে অভিনীত হয়েছে—তার হিসেব দেয়া শক্ত। এরই পূবদিকে ছিল তখন আমাদের কাছারী ঘর। দক্ষিণ দিকে ছোট তরফের কাছারী আর উত্তর দিকে—রাঙা তরফের কাছারী। পুকুরের ধারে রয়েছে মেজ তরফের কাছারী।

এর পর মণ্ডপ প্রাঙ্গণে ঢুক্‌তে একটি তোরণ দ্বার—তার মাথার ওপর সুন্দর গণেশ মূর্ত্তি।

আবার যে দ্বিতীয় চত্বরটি পড়িবে—সেটি হচ্ছে আমাদের মন্দির প্রাঙ্গণ। এই মণ্ডপে—দোল, দুর্গোৎসব, বাসন্তী পূজো প্রভৃতি বিভিন্ন পালা-পার্ব্বণ চলে, আর চলে গোপীনাথের নিত্য পূজো। উৎকল-ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণ ঠাকুর এই পূজোর দায়িত্ব নিয়ে আছে।

এরপর ভেতর বাড়ীতে আবার প্রত্যেক তরফের আলাদা আলাদা প্রাঙ্গণ। আমাদের অংশের নাম বড় তরফ্।

আমাদের বড় তরফের আবার দুটো উঠোন।

আমরা দু ভাই গিয়ে যখন বাড়ীর ভেতর পৌঁছুলাম—তখন কলের গানের চাইতেও যেন বিস্ময়ের বস্তু হয়ে উঠ্‌লাম।
আমাদের নিয়ে রীতিমত লোফালুফি সুরু হয়ে গেল! কে আগে কোলে নেবে—তার ঠিক নেই—এমনি আমাদের কদর বেড়ে গেল!

আমাদের বাড়ীতে রয়েছেন—জেঠিমা, জেঠিমার দুই ছেলে—রাঙাদা আর সোনাদা, আর এক জ্যাঠামশায়ের ছেলে—মেজদা। আমাদের বড় বৌ ঠাক্‌রুণ। এর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমাদের সব চাইতে বড় জ্যাঠতুতো ভাইয়ের। অর্থাৎ মেজদার বড় ভাইয়ের। খুব অল্প বয়েসে আমাদের সেই দাদা মারা যান। আমাদের এই বৌদি অসামান্যা রূপসী ছিলেন। বিধবা হবার পর থেকে বরাবর শ্বশুরের ভিটে আঁক্‌ড়ে আছেন। আজও বৃদ্ধা হয়ে পাকিস্তান ছেড়ে কোথায়ও নড়েন নি। প্রত্যহ সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বাল্‌ছেন—শ্বশুরের ভিটেয়।

এই বড়বৌ ঠাকরুণকে আমার মা খুব স্নেহ করতেন—যদিও শ্বাশুড়ী-বৌ সম্পর্ক ছিল—তবু তাঁকে দেখ্‌তেন নিজের মেয়ের মত।

মার শেষ জীবনে—চারু ছাড়া তাঁর একদণ্ডও চল্‌ত না। সেসব গেল অনেক পরের কাহিনী।

যাই হোক আমরা ত' বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। আমাদের তরফে ঢুক্‌তে বাঁ দিকে একটি "শিবকুণ্ড" ছিল। সেই শিবকুণ্ডে জেঠিমা, মারা যে প্রত্যহ শিবপূজো করতেন তার ফুল বেলপাতা ইত্যাদি ফেলে দেয়া হত। মণ্ডপের পূজোর ফুলও সেইখানে ফেলা হত। বাড়ীতে ঢোক্‌বার সময় এই শিবকুণ্ড থেকে এমন চমৎকার একটি ফুলের গন্ধ বেরুতো—যার আকর্ষণ আমার কাছে ছেলেবেলায় বড় কম ছিল না! বল্‌তাম—বাড়ী-বাড়ী গন্ধ!

পরে বড় হয়ে বিদেশে বসে যখনই বাড়ীর কথা ভেবেছি—শিব-কুণ্ডের স্নিগ্ধ ফুলের গন্ধ আমার নাকে ভেসে এসেছে!

এখন আর সে গন্ধ পাইনে!

কালের এলো-মেলো ঝোড়ো হাওয়ায় আমার জীবন থেকে সেই স্নিগ্ধ-ফুলের গন্ধ একেবারে হারিয়ে গেছে!

সোনাদা আমাকে ছোঁ মেরে কোলে তুলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে একেবারে দোতলার ঘরে গিয়ে হাজির হল।

সেইখানেই কলের গান বসানো আছে।

আমাদের মুন্সী বাড়ীর চারটে তরফ্‌—তা ছাড়া আশে-পাশের বাড়ীর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে কলের গানকে ঘিরে বসে আছে।

গ্রাম দেশে তখনকার দিনে 'কলের গান' সত্যি "তাজ্জব চিজই" ছিল!

সেদিন অনেকগুলি গানই শুনেছিলাম। তবে "ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা—ঘুচলো ভবের আনা গোনা" বলে যে একটি গান শুনেছিলাম—সে কথা বেশ মনে আছে।

মানুষগুলিকে কি করে এই কলের গানের বাক্সের ভেতর ভর্ত্তি করা হয়েছে—তারা কি করে বেঁচে আছে, তারা ওখানে কি খায় এইসব প্রশ্ন করে সেদিন বাড়ীর সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলাম।

কোনো প্রশ্নের উত্তরই সেদিন আমার কাছে সন্তোষজনক বলে

মনে হয় নি! চাবি ঘোরালেই বা মানুষগুলো গান গায় কেন—সেটাও ছিল একটা বিস্ময়কর ব্যাপার!

যাত্রার দলের গিরিকে বেশ মনে পড়ে।

এই গিরি নেপাল-গোপালের যাত্রা দলে সেনাপতি সাজ্‌তো, ভীষণ চীৎকার করে বীর রসের অভিনয় করত। তখন মনে করতাম—গিরির মতো সুখী লোক সংসারে আর কেউ নেই! ঝক্‌মকে পোষাক, মাথায় মুকুট, কোমরে তলোয়ার, পায়ে কাজ করা নাগ্‌রা জুতো, গলায় নানারকম মণিমুক্তোর মালা! সে যখন আসরে এসে শত্রুকে উদ্দেশ্য করে চীৎকার করে উঠ্‌ত "ওরে ওরে দুর্ব্বৃত্ত, শয়তান—পদাঘাতে যমালয়ে পাঠাবো রে তোরে—"

—তখন আমরা বিস্ময়ে প্রকাণ্ড হা করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তাম! চারদিক থেকে ঘন-ঘন হাততালি পড়ত। গিরির মুখ আনন্দে, উল্লাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ত। সে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে ঘন-ঘন মাথা নাড়তে থাক্‌ত!

তখন মনে মনে ভাব্‌তাম—যাত্রার দলের সেনাপতি হওয়াই সব চাইতে মজার কাজ। হাজার হাজার লোক তার বীরত্ব দেখে অবাক হয়, মুহূর্ত্তে রাজাকে উত্তেজিত করে সে যুদ্ধে পাঠায়, আবার সেই রাজাই শত্রু হস্তে বন্দী হয়ে পড়লে রাত্রির অন্ধকারে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করে রাজাকে মুক্ত করে নিয়ে আসে। বিশ্বাসঘাতককে শ্মশানে হত্যা করে আর উপযুক্ত লোককে দেয় পুরস্কার।

এমন যে সর্ব্বগুণান্বিত এবং অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন সেনাপতি তাকে কে না প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখবে? আমরা কয়েকজন সেনাপতি গিরিকে মনে-মনে পূজো করতাম!

অভিনয় করতে করতে গিরি যদি একবার আমাদের দিকে মৃদুহাস্যে তাকাতো ত' আমরা নিজেদের ধন্য মনে করতাম!

এই গিরির বাড়ী ছিল—গোয়ালন্দদের দক্ষিণ বাড়ীর কাছে।

কিন্তু অভিনয়ের আসর ছাড়া সাধারণভাবে যখন গিরিকে পথে-ঘাটে চল্‌তে দেখতাম—তখনও আমরা কম অবাক হতাম না! সেই যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সেনাপতি—সে কিনা ছেঁড়া কাপড় পরে একটা খালৈ হাতে নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছে? কখনো দেখতাম হাঁটুর ওপরে কাপড় তুলে সে খাল পার হচ্ছে—হয়ত মাথায় হাটের সওদা। কখনো দেখতাম খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—অনেকদিন কামানো হয়নি,—উস্কু-খুস্কু চুল—গিরি কারো কাছে হয় ত' পয়সা ধার চাইছে!

কোথায় তখন তার সেই গর্ব্বোন্নত শির,—চক্‌মকে পোষাক, মাথায় মুকুট আর কোমরে তলোয়ার? যার অঙ্গুলি হেলনে হাজার হাজার সৈন্য এসে শত্রু-ধ্বংস করতে প্রস্তুত—তার এ দৈন্য দশা কেন?

ভেবে ভেবে আমরা কিছুতেই কূল-কিনারা পেতাম না! তখন সেনাপতি গিরির জন্যে আমাদের দুঃখের পরিসীমা থাকত না!

তখন যদি কেউ গিরির জন্যে জীবন বিসর্জ্জন দিতে আহ্বান জানাতো, তবে আমরা অবলীলাক্রমে সম্মত হতাম!

আমার মামাতো বোন শান্তুর জন্মের কথা বেশ মনে পড়ে।

অতি ছেলেবেলা থেকে আমার দুঃখের অবধি ছিল না যে, আমার আপন কোনো বোন নেই! মামীর মেয়ে হলে ত' আপন বোনই হবে! সে তখন আমাকে ভাই ফোঁটা দেবে! কী মজা!

দোলের তখন দু তিনটে দিন বাকি আছে। হঠাৎ দেখা গেল—বাড়ীর উঠোনের ঠিক মাঝখানে—একটি ছোট টীনের ঘর তোলা হচ্ছে। তাতে ছোট-ছোট জানালা আর ঝাঁপের দরজা।

জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে কি হবে?

জবাব এলো, একটি ভাই হবে তোমার—

আমি বল্লাম, বোন হওয়াই ত' ভালো, দিব্যি ভাইফোঁটা দেবে। কিন্তু বাড়ী শুদ্ধু সকলের ইচ্ছে ভাই হোক।

কান্তুর স্মৃতিটা কারো মন থেকে মুছে যায় নি!

ভাই-ই হোক আর বোনই হোক—মামীকে আলাদা ওই ছোট্ট ঘরের মধ্যে গিয়ে থাকতে হবে কেন? আমাদের সঙ্গে ঘরে থাকলে দোষ কি?

এইসব প্রশ্ন সকলকেই করতে লাগলাম, কিন্তু আমার কথার কেউ উত্তর দেয় না।

ছেলে হওয়ার সময় নাকি আলাদা করে ওই ছোট্ট ঘরেই থাকতে হবে।

যে আস্‌বে বলে সকলের এত আনন্দ, মুখে মুখে এত মধুর জল্পনা-কল্পনা—সে হবে ছোট্ট ওই ঘরে? এটা কিন্তু আমার আদপেই ভালো লাগলো না!

যাই হোক আনুষঙ্গিক আয়োজন, উদ্যোগ চল্‌তে লাগ্‌লো, দাইকে খবর দেয়া হল। যে মাল্‌সায় আগুন জ্বালিয়ে ঘরে ধোঁয়া দেয়া হবে সেগুলি কুমোর বাড়ী থেকে কেনা হল। ইতিমধ্যে অনেকগুলি কাঁথাও তৈরী করা হয়েছিল। আমাদের নতুন ভাই বা বোন যে হবে—সে নাকি এই কাঁথার ওপর শোবে আর ওয়াঁ-ওয়াঁ করে কাঁদ্‌বে!

মামীর কাছে সব শুনি আর আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না! সেই ছোট্ট বোনটা নাকি আমার কোলেও উঠবে।

ঘরের ভেতর বাঁশ দিয়ে মাচা তৈরী করা হয়েছে। তারই ওপর বিছানা করে মামী আর নবজাত শিশু শোবে এই ঠিক আছে।

কেন যে আলাদা করে খাট পেতে দেয়া হল না—সে কথাও আমি ভালো করে বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না। আমাদের সব ঘরে এত খাট—আর আসল কাজের সময় একটি ভালো খাট জুটলো না—এটা কিন্তু আমার ভারী বিচ্ছিরি ব্যাপার বলে মনে হতে লাগলো।

যাই হোক—দিন গুন্‌তে থাকি—কখন ভাই বা বোন জন্মাবে। দাদি মাসিকে বলে রাখি, অনেক রাত্তিরে যদি ভাই বা বোন হয়—তবে আমায় ডেকে দিও কিন্তু। শেষকালে যে বল্‌বে—ওই যাঃ—ভুলে গেছি ত! সে কিন্তু চল্‌বে না—হ্যাঁ!

বেশ মনে আছে—দিনের বেলাতেই শানু জন্মেছিল।

আমরা মামার বাইরের ঘরে বসে—কি যেন খেল্‌ছি—মামাও সেখানে রয়েছেন। হঠাৎ দাদিমাসি এসে খবর দিলে, তোর একটি সুন্দর বোন হয়েছে!

ছুট! ছুট! ছুট!

বোনকে দেখতে হবে।

ওমা! ঘরের দরজা যে বন্ধ।

এখন নাকি দেখা চল্‌বে না!

দাই যে ভেতরে কী কাণ্ড করছে সেই জানে! আমাদের বোন—আর আমাদেরকেই দেখতে দেখে না?

সেদিন দাইটার ওপর মনে-মনে ভারী চটে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনি—

ওয়াঁ—ওয়াঁ—ওয়াঁ—!

তা হলে ত' সত্যি আমাদের বোন হয়েছে!

কিন্তু বোনকে ওরা দেখাচ্ছে না কেন?

দাদিমাসি বল্লে, বোনের মুখ দেখতে হলে মোহর চাই।

মোহরটা কি জিনিস? দেখি নি ত!

আঁতুর ঘরের দরজায় মুখ বাড়িয়ে কখনো-সখনো বল্‌তাম,—আমি ঘরের ভেতর যাবো,—বোনকে কোলে নেবো!

মামী চোখ পাকিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর দিতেন, খবরদার, ঘরের ভেতর আস্‌বি নে, তা হলে চান করতে হবে!

এ-যে কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারতাম না!

বোন এলো আমাদের ঘরে, আর তাকে ছুঁলে স্নান করতে হবে কেন? আমরা যে বেড়ালকে কোলে করে আদর করি তখনও ত' স্নান করতে হয় না! মানুষ কি বেড়ালের চাইতেও অশুদ্ধ?

আমার মনে নানা প্রশ্নের ভীড় জম্‌ত!

কিন্তু সে সব প্রশ্নের জবাব দেবে কে?

মামীর জন্যে আলাদা কলাইকরা থালায় ভাত যেতো আঁতুর ঘরে। এসব ব্যাপার দেখে আমার খুব খারাপ লাগ্‌তো। কি-যে মানে

কিছুই বুঝতে পারতাম না। সন্ধ্যেবেলা ঘর ধোঁয়ায় ভরে যেত। ওই ঘরে বোন বাঁচবে কি করে—এ ছিল আমার মস্ত বড় ভাবনা!

আগেই বলেছি দোলের কয়েকদিন আগে শানুর জন্ম হয়। এই সময় আমরা খুব পট্‌কা ছুঁড়তাম। ইচ্ছে করে আঁতুর ঘরের কাছে এসে পট্‌কা ফোটাতাম! মামী ভেতর থেকে চীৎকার করে উঠ্‌তেন—ওরে অমন করে পট্‌কা ফোটাস নে, তোর বোন চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌ছে! শুনে ভারী মজা লাগ্‌ত!

জীবনে প্রথম যে দিন স্কুল পালিয়ে ছিলাম—সেদিনকার কথা আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আমি যে হামেশা স্কুল পালিয়ে কাঁচা আম আর কুলের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতাম—তা কিন্তু মোটেই নয়।

সত্যি কথা বল্‌তে কি—স্কুলে না যাওয়ার কাণ্ড ঘটিয়েছিলাম আমি মাত্র একবার। আমার জীবনের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার কথা দিব্যি মনে আছে। কিন্তু সেদিন ইস্কুল কামাই করার ব্যাপারে দায়ী আমি ছিলাম না—সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিলেন বাঙ্‌লা দেশের একজন গল্প বলিয়ে।

এইবার আসল ঘটনায় আসা যাক্।

আমাদের অঞ্চলে খাল-বিল-নদী-নালা প্রচুর। বর্ষাকালে নৌকো ছাড়া এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী যাওয়া চলে না—একমাত্র সাঁতার দেয়া বাদে।

সেবার মামাবাড়ীর বার-বাড়ীতে বেশ একটা বড় নৌকো তৈরী হচ্ছে। আমরা তার ওপরে উঠে অনেক সময় খেলা করি। মামা-বাড়ীর ভেতর বাড়ীতে পুকুর, আর সাম্‌নের দিকে খাল। বর্ষাকালে সেই খাল একেবারে টুই-টুম্বুর ভর্ত্তী থাকে—আর আমরা নৌকো করে দল বেঁধে ইস্কুলে যাই। এই নৌকো করে যাবার পালাটা ভারী আনন্দের;—একেবারে যাকে বলে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের ব্যাপার!

ছুতোর মিস্ত্রিরা যখন কাজ করে না—সেই সময় ওই আদ্ধেক

তৈরী নৌকোখানির ওপর বসে ছোটদের আসর। গল্প, গান, হুল্লোড়, ইস্কুলের মাষ্টারদের মারের গল্প চলে ওই মন-পবনের নৌকোর ওপর বসে।

সেদিন সকালবেলা—কি জানি কেন ছুতোর মিস্ত্রির দল কাজে আসে নি, কাজেই আমাদেরও আর পাঠ্য পুঁথিতে মন বসেনি। সবাই এসে জুটেছি ওই নৌকাটার ওপর।

দক্ষিণ বাড়ী থেকে গোয়ালন্দ এসেও হাজির। তার হতে চক্ চকে ঝক্‌ঝকে একখানি বাঁধানো বই—গাঢ় নীল রঙ—আর তার ওপর রূপোলী কারুকার্য্য।

ছোটদের জন্যে এমন সুন্দর বইও পৃথিবীতে আছে নাকি? দেখে ভারী লোভ হল। তার কারণ ইস্কুল-পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্য গল্পের বই সে যুগে আমরা অজ পাড়াগাঁয়ে বসে দেখতে পেতাম না। তখন পাঠ্যপুঁথির বাইরে যে বইখানি পড়েছি তার নাম হচ্ছে 'হাসিখুশী'। সেও ত বেশ কিছুদিনের কথা। কাজেই এই জাতীয় ঝক্‌মকে একখানি গল্পের বই কারো হাতে দেখলে শিশু-চিত্ত যে কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

মনে অনেকখানি চাঞ্চল্য আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গোয়ালন্দের কাছ থেকে বইখানি একবার দেখতে চাইলাম।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, গোয়ালন্দ সেই "সাত রাজার ধন মাণিক"কে কিছুতেই হাত ছাড়া করতে রাজী নয়।

শেষকালে কাঁচামিঠে আমের লোভ দেখিয়ে তার শক্ত মনটাকে কিছুটা নরম করা গেল!

সেই অদেখা-মাণিক এলো আমার হাতে।

সত্যি,—সাত রাজার-ধন-মাণিকই বটে!

আজকের দিনের ছেলেমেয়েদের একটা কথা মনে রাখতে বলি যে, এখনকার মতো আমাদের ছেলেবেলায় ছোটদের কোনো বার্ষিকী ছাপা হত না। আমাদের সেই শৈশবে—মনমাতানো কোনো গল্পের বই হাতে পড়েছে বলে মনে পড়ে না। কাজেই দুর্ভিক্ষের দেশের একটি

আধমরা মানুষের হাতে হঠাৎ এক থালা চম্‌চম্ তুলে দিলে যে অবস্থা হয়—আমারও মনের ভাব হল ঠিক সেই রকম।

চোখ দুটো যতদূর সম্ভব বড় বড় করে তাকিয়ে দেখলাম—বইখানির নাম—ঠা—কু—র—মা—র—ঝু—লি!

আমার নিজের ঠাকুরমাকে আমি চোখেই দেখি নি! আমার অবশ্য দিদিমা আছেন। তিনি আমার কাছে গল্প বলেন না—কিন্তু খাওয়াতে খুব ভালোবাসেন।

গল্প অবশ্য শোনাতো—আত্মারাম ঠাকুর—দাদিমাসি আর মামী।

কিন্তু ঠাকুরমার ঝুলি!

এ যে শিশু মনের স্বপনপুরীর তোরণ দ্বার খুলে দিলে! মনে হল—এই ঘুমন্ত দেশে—হঠাৎ 'সোনারকাঠি' আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে!

সেই নৌকোর ওপরে বসেই একটি গল্প পড়ে বুঝতে পারলাম—ছোটদের মনকে একান্ত করে দোলা দেবার, কেড়ে নেবার, মাতিয়ে তোল্‌বার যে ভাষা—সেই কথা, সেই ছড়া—সেই সুর কে যেন মুঠো-মুঠো তুলে এনে 'ঠাকুরমার ঝুলির' পাতায়-পাতায় ছড়িয়ে দিয়েছে! ছেলেরা যেমন নাকি মাঠ থেকে তুলে নিয়ে আসে কচি মিষ্টি মটর শুঁটি!

এর প্রতিটি কথায়—প্রতিটি ছত্রে—প্রতিটি ছড়ায় আলাদা গন্ধ, আলাদা স্বাদ!

কোথায় লুকিয়ে ছিল এই ঝুলি এদ্দিন?

ভেবে দিশেহারা হই আমি!

আকুল আগ্রহ নিয়ে পড়ে চলি—অরুণ বরুণ কিরণমালার গল্প, বুদ্ধু-ভূতুমের কাহিনী, রাক্ষস-খোক্কসের কথা—

বেলা বেড়ে চলে—

দাদিমাসি এসে ডেকে যায় ইস্কুলের বেলা হল!

সেদিকে আমার বিন্দুমাত্র হুশ নেই!

ছবি দেখি আর বইয়ের পাতা উল্টে চলি।

ছবিগুলোই বা কী চমৎকার—যেন গল্পের সঙ্গে একেবারে তাল মিলিয়ে আঁকা হয়েছে !

মানুষ যেমন খুব ভালো-খাবার চেখে-চেখে খেতে চায়, আমারও ঠিক তেমনি মনের সাধ।

কিন্তু গোয়ালন্দ বলেছে—একদিনের মধ্যে বইটি ফেরৎ দিতে হবে ঝুলির সমস্ত রসের আস্বাদ নিতে হবে।

কাজেই পৃথিবী রসাতলে যাক্—অন্য কোনো দিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই আমার।

সূর্যিমামা মাথার ওপর উঠে আসে—কিন্তু তখন আমার মন ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর পিঠে চেপে উড়ে চলেছে—সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে।

একটা সুবিধে এই ছিল যে, মামা তখন কল্‌কাতায়, আর মা কিম্বা মাসিমা অন্দর ছেড়ে বারবাড়ীর দিকে কিছুতেই আস্‌বেন না !

গল্পের পর গল্প—ছড়া, ছবি আর মজাদার কাহিনী পাল তোলা নৌকোর মত আমার মনকে টেনে নিয়ে চলে উজান পানে।

তারপর কখন যে ঠাকুরমার ঝুলির শেষ পাতায় গিয়ে পৌঁছুলাম, আর কখন যে আমি নৌকো থেকে নেমে বাড়ীর ভেতর চলে এলাম সে কথা আর আদপেই মনে পড়ছে না ! পাহাড় আর মেঘের ছবি যেমন—একাকার হয়ে যায়—ঠিক তেমনি সে ঘটনা আমার স্মৃতির পটে মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে !

শুধু এইটুকু মনে আছে—যে, বাংলাদেশের এক নাম-না-জানা গাঁয়ের একটি অচেনা কিশোর 'ঝুলির' মাধুরিমায় মুগ্ধ হয়ে ভুলে গিয়েছিল ক্ষিদে-তেষ্টা, ভুলে গিয়েছিল—ইস্কুলে যাবার কথা, ভুলে বসেছিল বাড়ীতে মার খাবার ভয়কে। সেদিন সেই ছেলেটি আচম্‌কা সব কিছুর বিরুদ্ধে 'ধর্ম্মঘট' ঘোষণা করে পক্ষীরাজের সঙ্গে উধাও হয়ে গিয়েছিল—অজানা পথে-বিপথে !

এখন বিচার করতে হবে—এই স্কুল পালানোর জন্যে দায়ী

সেদিনকার সেই আত্মভোলা কিশোর—অথবা সেই অজানা জগতের পথ-প্রদর্শক শিশু-মনের অপরূপ-মায়াবী দক্ষিণারঞ্জন ?

আমরা মামাবাড়ী থেকে বর্ষাকালে সবাই দল বেঁধে নৌকো করে ইস্কুলে যেতাম। বড়দা, বদনদা, দাদা যেতো সন্তোষ জাহ্নবী স্কুলে, আর আমাকে নামিয়ে দিয়ে যেতো সাকরাইল স্কুলে।

প্রতিদিন ইস্কুলে যাবার মুখে আর ফিরতি পথে নৌকোর আগা-গলুইয়ে বসা নিয়ে ঝগড়া বেঁধে যেতো।

এই প্রতিযোগিতায় বদনদাদাই বেশীদিন জয়লাভ করত। দাদা ত' শেষ পর্য্যন্ত এক কবিতাই লিখে ফেল্লে। সেই কবিতার প্রথম তু'লাইন অনেকটা এই জাতীয় ছিল—

আগা গলুইয়ে বসা ধার্য্য
বদন দাদার বাঁধা কার্য্য ॥

এই কবিতা শুনে আমার কিন্তু ভারী আশ্চর্য্য মনে হয়েছিল।

দাদা তবে কবিদের মতো কবিতা লিখতে পারে? তা হলে ত' বড় সোজা মানুষ নয়।

এই ঘটনার পর থেকে দাদাকে আর এক চোখে দেখতে লাগলাম। সত্যি, কবিতা মেলানো ত' আর চারটিখানি কথা নয়।

মনে আছে, ছোট দাদামশাইও দাদাকে এই কবিতা রচনার জন্যে প্রশংসা করেছিলেন আর উৎসাহ দিয়েছিলেন।

আমি কিন্তু কাউকে কিচ্ছু না জানিয়ে—গোপনে-গোপনে কবিতা মেলাবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লাম।

যতই মেলাতে যাই—দেখি, কাজটি বড় সোজা নয়। যদি বা মিল জোটে—কিন্তু তার অর্থ হয় না!

অর্থ যদি পরিষ্কার হল—তা হলে মিলের দিকটা আবার গোল-মেলে হয়ে রইল!

ভারী মুস্কিলের ব্যাপার ত' কবিতা লেখা!

আবার মনে-মনে ভয় আর লজ্জা তুই-ই আছে!

যদি আমার এই কবিতা-লেখা কেউ দেখে ফেলে !

সন তারিখ বল্‌তে পার্‌বো না। তখনো আমি স্কুলে যাই নে।

সেই সময়ে যে একবার ভূমিকম্প হয়েছিল—তার কথা আমার বেশ মনে আছে।

মামাবাড়ীতে পশ্চিম-দ্বারী একটি দালান আছে। সেই দালানে দাদিমাসি না কে—ঠিক মনে করতে পারছিনে—আমাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে।

দাদিমাসির হাঁটুর ওপর আমি শুয়ে আছি। আমার মাথায়, কানে পিঠে ক্রমাগত চাপড় পড়ছে—ঘুমুবার জন্যে। কিন্তু ঘুম আস্‌ছে না।

তখন বোধকরি আমার ইচ্ছে রয়েছে—রদ্দুরে-রদ্দুরে খেলার সাথীদের সঙ্গে ঘুরে হুল্লোড় করা।

কাজেই পিঠ্ চাপড়ে কি হবে?

আমি কেবলি চোখ পিট্ পিট্ করছি—আর ভাব্‌ছি—দাদিমাসি যদি নিজে ঘুমিয়ে পড়ে—তবে আমি পালাবার বেশ সুবিধে পাই।

দেয়ালের ধারে—দাদিমাসির পায়ের কাছে ছিল—একগাদা ট্রাঙ্ক আর বাক্স পর পর সাজানো।

হঠাৎ শব্দ শুনি ঠক্—ঠক্—ঠক্ !

ট্রাঙ্কগুলো এমন করে নাড়াচ্ছে কে ?

চোখ পিট্ পিট্ করে আরো দু-একবার তাকিয়ে দেখলাম। তারপর আর থাক্‌তে না পেরে শুধোলাম, দাদিমাসি, বাক্সগুলো অমন করে নাড়াচ্ছ কেন ?

দাদিমাসি উত্তর দিলে, কৈ আমি ত' নাড়াই নি !

—তবে কে নাড়াচ্ছে ভূতে ?

সঙ্গে সঙ্গে আবার নড়ে উঠ্‌ল—ঠক্—ঠক্—ঠক্ !

দাদিমাসি সত্যি এবার অবাক হল।

তারপর হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে লাফিয়ে উঠে বল্লে, ভুঁইকম্প—ভুঁইকম্প !!

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কোলে নিয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ঘর ছেড়ে উঠোনের মাঝখানে—চ্যাচামেচি সুরু করে দিলে!

—ওরে কে কোথায় আছিস্—বাইরে আয়,—শাঁখ বাজা—মা-বাসুকী মাথা নাড়া দিয়েছেন—হেঁই মা-কালী—হেঁই মা-দুগা—

যে যে-ঘরে ছিল ছুটে এসে জড় হল উঠোনে!

তারপর উত্তেজনাটা কম্‌তে—দিদিমার আদেশে টেলিগ্রাম গেল কল্‌কাতায় মামা কেমন আছেন জানবার জন্যে।

আমাদের ছেলেবেলায় গ্রামে বারো মাসে তের পার্ব্বণ প্রচলিত ছিল। গ্রামটি ছোট—আর বৈদ্যি প্রধান। মাত্র তিন ঘর ব্রাহ্মণ, কয়েক ঘর কায়স্থ—আর বাদ বাকি সব বৈদ্যি। গ্রাম সুরু হয়েছে চকের বাড়ী থেকে। চকের বাড়ীর কর্ত্তা হচ্ছেন উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী। ইনি পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'ফরোয়ার্ড' কাগজের সম্পাদক-রূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর বাড়ীটি গ্রাম থেকে একটু তফাতে এবং মাঠের সাম্‌নে বলে নাম হয়েছে চকের বাড়ী। গ্রামটি শেষ হয়েছে—দত্তদের বাড়ীতে। এই দত্ত বাড়ীর একটি ছেলে চমৎকার প্রতিমা তৈরী করতে পারত। পরবর্ত্তী জীবনে সে ময়মনসিংহ শহরে গিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল।

যে পালা-পার্ব্বণের কথা বল্‌ছিলাম।

আমাদের ছেলেবেলায়—প্রত্যেকটি বাড়ীতে দুর্গোৎসব হত। যখন এক সঙ্গে ঢাকের বাদ্যি সুরু হত—তখন কী মজাই না লাগ্‌ত!

আমাদের পালা-পার্ব্বণ সুরু হত—নববর্ষ থেকে। নববর্ষ তখন ছিল হালখাতার উৎসব।

কিন্তু সেই অতীতকালেও আমাদের গ্রামে নববর্ষের দিন সন্ধ্যেবেলা গান-বাজনা হত, ছোটরা কবিতা ও ছড়া আবৃত্তি করত। কলের গানে (তখন পর্য্যন্ত ঐ নামই ছিল) নানারকম রেকর্ড বাজানো হত। সে সময় লালচাঁদ বড়ালের গান আর নানা জাতীয় শ্যামা-সঙ্গীত খুব প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে যে-জাতীয় "অ্যাকটিং" রেকর্ড করা

হত—আজকের দিন কোনো সান্ধ্য-মজ্‌লিসে সেগুলি বাজালে লোকে কমিক্‌-রেকর্ড মনে করে হেসে খুন হবে!

নববর্ষের দিন দুপুরবেলা প্রত্যেক বাড়ীতেই ভালো খাওয়া-দাওয়া হত। ভালো খাওয়া দাওয়া বলতে মাছ, মাংস, পরমান্ন, দৈ ইত্যাদি। সে সময় লোকে খেতেও পারত প্রচুর। সন্ধ্যেবেলা নববর্ষ উৎসবে নানারকম ফল, রসগোল্লা আর সরবৎ বিতরণ করা হত। গ্রামে তখন চায়ের প্রচল একেবারে ছিল না। রোজকার জল খাবার ছিল—মুড়ি-নারকেল, চিড়ে-গুড়, মুড়ির মোয়া, চিড়ের মোয়া, ঘন ক্ষীর, বিভিন্ন সময়কার ফল---এই সব। তখন গ্রামে বিড়ি-সিগারেটের প্রচলনও বিশেষ দেখিনি। বুড়োর দল সকাল-সন্ধ্যেয় হুঁকো টান্‌তেন আর মজ্‌লিস্‌ জমাতেন। দুষ্টু ছেলেরা বুড়োদের লুকিয়ে সেই হুঁকোয় কখনো-সেখনো টান দিত আর খক্‌-খক্‌ করে কাস্‌তো!

ছেলেবেলায় দেখেছি নববর্ষের দিন অতি ভোরে গ্রাম-সঙ্কীর্ত্তন বেরুত একেবারে খোল-করতাল নিয়ে। তাতে গাঁয়ের অনেক বাড়ীর কর্ত্তারাই যোগদান করতেন এবং গলা খুলে্‌ গান গাইতেন। গ্রামের বারোয়ারী কালী বাড়ীতে পৌঁছে হরিরলুট দেয়া হত।

বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন প্রত্যেক বাড়ীর গিন্নিরা কাসুন্দী তৈরী করতেন। এই কাসুন্দী আর নুন নিয়ে ছোট ছেলের কাঁচা আম খাওয়ার ধূম পড়ে যেত। আম যত টক হবে, জিব যত জড়িয়ে আস্‌বে—তত খাওয়ার আনন্দ! চোখ দিয়ে যদি জলই না বেরুলো তবে কাসুন্দী দিয়ে কাঁচা আম খাওয়ার মজা কোথায়? আর এক রকম কচি গাছ গজাতো এই সময়—তার নাম ছিল 'সলফে সজ'। এই সলপে সজ আর লঙ্কা দিয়ে কাঁচা আম খাওয়াও গিন্নিদের মধ্যে খুব চল ছিল। ছোটরা আশে-পাশে ঘুর্‌-ঘুর্‌ করত আর একটু-আধটু ভাগ পেতো। কাসুন্দী প্রথম চাখ্‌বার সময়ও মজার ব্যাপার ছিল। কেউ বলতে পারবে না ঝাল, বল্‌তে হবে মিষ্টি! নইলে নাকি সর্ব্বনাশ!

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে গাঁয়ে বর্ষার জল আসে। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তার জন্যে দিন গুণতে থাকে।

গ্রামে বর্ষার জল আসা যে কী মজার ব্যাপার—শহরের লোক তা ঠিক বুঝতে পারবে না।

কাজেই লৌহজঙ্গ নদী—যার ওপর টাঙ্গাইল শহর, সেই নদীর জল বাড়ে আর গাঁয়ের লোকের মুখে হাসি ধরে না।

—আজ চার ইঞ্চি বেড়েছে—

—আজ আরও বেশী—

—আজ একেবারে এক হাত—

জল এগিয়ে আসে গাইজা বাড়ীর খাল দিয়ে গাঁয়ের মুখে। ও-অঞ্চলের চাষা-ভূষোর দল রাতারাতি বাঁধ দিয়ে ফেলে। বিরাট প্রাচীর তৈরী করে ওরা মাটি নিয়ে।

এই বাঁধ যখন ভেঙে দেয়া হবে—তখন যা মাছ উঠ্‌বে তা ওরাই জানে।

সবাই এখন থেকে মুখ চোট্‌কাতে থাকে। তেল আর লঙ্কার ব্যবস্থা রাখে ঘরে ঘরে।

সব রকম মাছই পাওয়া যায়। তবে মছি মাছ (কল্‌কাতায় মৌরলা) নামে যে ছোট ছোট মাছ ঝাঁকে-ঝাঁকে আসে—তা দিয়ে পেঁয়াজ চচ্চড়ি ভারী মুখরোচক।

খালৈ, পল ট্যাটা, বানা সব তৈরী হতে থাকে ঘরে ঘরে। যাদের পুরাণো আছে—তারা মাচা থেকে নামিয়ে, ধূলো ঝেড়ে নূতন করে, গাব লাগায়।

বর্ষাকালে মাছ ধরার মতো এমন সার্ব্বজনীন উৎসব গ্রামে খুব কমই আছে। আর এই মহোৎসব জমে ওঠে রাত্তির বেলায়! ঘুটঘুট্টি অন্ধকার—তারই ভেতর সবাই মাথায় পাগড়ী কিম্বা গামছা বেঁধে পিঠে খালৈ ঝুলিয়ে আর হাতে পল নিয়ে কী বিরাট অভিযান!
হঠাৎ বাইরের লোক কেউ দেখ্‌লে মনে করবে এরা কি দল বেঁধে ডাকাতি করতে চল্ল নাকি?

জ্যৈষ্ঠমাসে আর একটি সুন্দর পার্বণ ছিল।

পার্বণের নাম ষষ্ঠী ব্রত।

মা ষষ্ঠী হচ্ছেন—সন্তানের দেবতা। বেড়াল তার বাহন। এই দিনে গাঁয়ের বৌ-ঝিরা খুব সকালে উঠে স্নান করত। পাখা, ধান-দুর্ব্বা, আম হাতে নিয়ে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের ভিজে কাপড়েই আশীর্ব্বাদ করত—যাট্—যাট্—যাট্!

মা ষষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের সেদিন ভারী আনন্দ।

ষষ্ঠীব্রতের পর—তারা আম-ক্ষীর খেতে পেতো।

পূর্ব্ববঙ্গে যেটা ষষ্ঠীব্রত—পশ্চিমবঙ্গে সেই পার্বণই জামাই ষষ্ঠী নামে পরিচিত। অবশ্য পূর্ব্ববঙ্গে, জামাইকে নতুন ধুতি, জামা, চাদর ইত্যাদি দেবার প্রথা প্রচলিত আছে—তবু পশ্চিম বঙ্গে জামাই ষষ্ঠীটাই বড় উৎসব।

খাল বেয়ে জল এসে গাঁয়ের প্রতি বাড়ীর পুকুরে যখন জল পড়ে তখন আর এক উপভোগ্য দৃশ্য। প্রতিটি পুকুরের মুখেই মাছ ধরবার জন্যে অমনি করে বাঁধ বাঁধা হয়। তারপর রাত্তিরে সেই বাঁধ ভেঙে দিয়ে জালি, পল, ট্যাটা নিয়ে প্রচুর মাছ ধরা হত।

বর্ষাকালে এক রকম ধান হয়—যা জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফন্‌ফনিয়ে বাড়ে। আমরা অনেক সময় নৌকো করে সেই ধান ক্ষেতে ঘুরে বেড়াতাম বিকেলের দিকে। এই সব ধানের ক্ষেতে প্রচুর মাছ লুকিয়ে থাকে। লোকে নৌকো থেকে ট্যাটা দিয়ে সেই মাছ ধরে। ট্যাটা হচ্ছে বাঁশের লম্বা লাঠি—তার আগায় তীক্ষ্ণ লোহার ফলা—এমন বাঁকানো যে লক্ষ্য স্থির করে ছুঁড়ে দিলে মাছ তার মধ্যে গেঁথে যায়। ঠিক বকের মতো চুপচাপ নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে মাছের গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে হয়। তারপর বড় মাছ হাতের কাছে এলেই এই ট্যাটা ছুঁড়ে মারতে হয়। লক্ষ্য যাদের খুব ঠিক কেবল তারই এই ট্যাটা দিয়ে মাছ ধরতে পারে। আমাদের গায়ে তখন—পাগাইর‍্যা ঘোলই প্রভৃতি লোকেরা খুব অদ্ভুত ভাবে ট্যাটা চালিয়ে মাছ ধরতে পারত। এই জাতীয় মানুষ অবশ্য গাঁয়ে আরো ঢের ছিল।

এই যে গভীর রাত্তিরে উঠে মাছ ধরার হুল্লোড়—এতে গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীর ছেলেরা যোগদান করত। টিম্‌টিমে লণ্ঠন জ্বালিয়ে

নিশাচরের মতো সবাই বেরিয়ে পড়ত। সব সময় যে এতে অভিভাবকদের সম্মতি থাক্‌ত তা নয়। অনেক সময় ছেলেরা বাড়ী থেকে পালিয়ে আস্‌ত।

এই মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে গাঁয়ে অনেক ভূতের গল্পও প্রচলিত ছিল। অমুক বাড়ীর ছেলে অনেক রাত্তিরে খালৈ ভর্ত্তী মাছ নিয়ে বাড়ী ফিরছিল—। সেই বট গাছটার তলা দিয়ে একা একা যখন আস্‌ছিল হঠাৎ ওপর থোক নাকি স্থর শোনা গেল—আঁমায়—এঁকটা—শোঁল—মাঁছ—দিঁয়ে—যাঁ—নাঁ—রেঁ—!

ছেলেটা অজ্ঞান হয়েই পড়ে যাচ্ছিল! বামুনের ছেলে ত'! হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। পৈতাটা ডান হাতে জড়িয়ে ধরে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে—তবে প্রাণ নিয়ে ফিরে আস্‌তে পারে।

এই জাতীয় মুখ-রোচক গল্প প্রায়ই শুন্‌তে পাওয়া যেত সেই সময়। গাঁয়ে মানুষও ছিল, ভূতও ছিল—পরস্পরের মানিয়ে নিয়ে চল্‌তে হত আর কি!

সভ্যতা আর শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভূতগুলো যে কোথায়—কোন রাজ্যে পালিয়ে গেল—তার আর কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

অবশ্য ভূত বিশ্বাস করার মধ্যে অনেকখানি চাঞ্চল্য আর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মজা লুকিয়ে আছে। সেগুলো আমরা সরাসরি জীবন থেকে বাতিল করে দি কি করে?

আর আরো কৌতুকের ব্যাপার—ভূত, পেত্নী, শাক চুন্নি—(অবশ্যি ব্রহ্মদৈত্যি না) এরা নাকি মাছি খেতে ভালোবাসে। মাছের কথা উঠ্‌লেই বাঙালীর নোলায় যদি জল গড়ায় তবে বাঙালী ভূতেরাই বা মাছ খেতে চাইবে না কেন?

আমাদের ছেলেবেলায় ভূতগুলো গাঁয়ের কোথায় কোথায় ঘাঁটি করে আত্মরক্ষা করছিল—সেই সময় তার একটা ফিরিস্তি তৈরী করা হয় নি বটে—তবে এ কথা বলা চলে যে,—তেমাথার মোড়ের বট গাছে, পুরোনো শিব মন্দিরের বেলগাছে, স্যাওড়া গাছতলায়, এঁদো পুকুরের

ধারে, কতকগুলি পোড়ো বাড়ীতে ভূত, ব্রহ্মদৈত্যি আর শাকচুন্নির দল—দিব্যি ছানা-পোনা নিয়ে বসবাস করছিল। গাঁয়ের লোকদের তারা বিলক্ষণ চিন্‌তো—তাই মাঝে মাঝে আবদার করা ছাড়া খুব বেশী উপদ্রব এরা করত না! ভূতরাও ত' গাঁয়ের বাসিন্দা! তাদেরও ত' কিছুটা দাবী ছিল গাঁয়ের ওপর!

আমাদের গ্রামের খুব নাম করা পার্ব্বণ ছিল—শ্রাবণ-সংক্রান্তি। এইদিনের বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে মা মনসার পূজো হয়। কিন্তু আমাদের গ্রামে এই উপলক্ষে বিরাট নৌকো-বাচ্ হত।

এই সময় সারাটা গাঁ একেবারে টুইটম্বুর জলে ভর্ত্তি থাকত—তাই নৌকোবাচের ভারী সুবিধে ছিল।

এই নৌকা-বাচ্ উপলক্ষে পূবপাড়া আর পশ্চিমপাড়ার মধ্যে নৌকো সাজানো নিয়ে দারুণ প্রতিযোগিতা চল্‌ত প্রতি বছর। উৎসবের প্রায় দুই মাস আগে থেকে দুই দলেই নৌকো সাজানো হত। এই নৌকো সাজানোর ব্যাপারেও খুব বাহাদুরী ছিল বল্‌তে হবে। পাশা-পাশি অনেকগুলো নৌকো রেখে বাঁশ দিয়ে তার ওপর চমৎকার মঞ্চ তৈরী করা হত। আর সেই মঞ্চের ওপর দশ-মহাবিদ্যা প্রভৃতি এবং পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে নানাবিষয় সাজিয়ে রাখা হত। গ্রামের লোকেরাই বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাক্‌ত। আর একটি বিষয় ছিল—নানারকম নক্সা ও সং বের করা। সারা বছর ধরে গ্রামে যে সব মজার ঘটনা ঘটেছে তাকে কেন্দ্র করেই এইসব সং সাজানো হত এবং ছড়া লেখা হত। কোন্ পাড়ার কোন্ কর্ত্তা কালীবাড়ী ফণ্ডের টাকা ভেঙেছে, কোন বাবু একটু বেশী রকম স্ত্রৈণ, কোন কর্ত্তা বেশী বয়েসে গোপনে আবার বিয়ে করার জন্যে ঘটক লাগিয়েছে,—এইসব মুখরোচক বিষয় নিয়ে সং সাজানো হত এবং গ্রামের লোক সেগুলি ভারী উপভোগ করত। পল্লী কবিরাই এসব ব্যাপারে কবিতা রচনা করত, ছড়া তৈরী করত আর লোকদের দিয়ে গান গাওয়াত।

এছাড়া নৌকা-বাচের উত্তেজনা ত' ছিলই। এই নৌকো-বাচের প্রতিযোগিতায় হিন্দু-মুসলমান সকলেই যোগ দান করত।

নৌকো সাজানোর ব্যাপারে ছুটি ঘাঁটি ছিল।

পশ্চিমপাড়ার ঘাঁটি ছিল—মামাবাড়ীর মণ্ডপ প্রাঙ্গণে। আর পূবপাড়ার ঘাঁটি ছিল—জগৎদাসের উঠোনে।

প্রচুর বাঁশ কেটে এনে স্তুপীকৃত করা হত। এই বাঁশ গায়ের লোকেরা নিজ নিজ বাঁশের ঝাড় থেকে চাঁদা হিসেবে দান করত। অন্য সময় হয়ত একটি বাঁশের জন্যে লাঠালাঠি অবধি হয়ে যাবে, কিন্তু নৌকো বাচের ব্যাপারে সবাই মুক্ত হস্ত।

দিনের বেলা যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত থাকত। কেউ ক্ষেতে কাজ করত, কেউ জন খাট্‌ত—কিন্তু সন্ধ্যের পর সবাই জমায়েৎ হয়ে বাঁশ কাট্‌তে সুরু করে দিত। এই কাজ ওদের চল্‌ত অনেক রাত পর্য্যন্ত।

মামা বাড়ীতে আমরা তিন জনে বড় মামার বাইরের বাড়ীর দালানের একটি কামরায় লণ্ঠন জ্বালিয়ে পড়াশুনা করতাম। ছা' মাসি, ছোক্কন আর আমি। আমরা তিনজনে রাত্তিতে পড়াশুনা শেষ করে লণ্ঠন হাতে যখন অন্দর মহলের দিকে যেতাম—তখন দেখতাম পশ্চিমপাড়ার উৎসাহীর দল—ঘন ঘন তামাক টান্‌ছে আর বাঁশে খটাখট্‌ দা' চালাচ্ছে। কুইনা মামাকে জিজ্ঞেস কর্‌তম, কত রাত্তির কাজ চল্‌বে? ওরা হেসে উত্তর দিত—এই ত' সবে সুরু।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুন্‌তাম এই খটাখট্‌ শব্দ! ওরা মঞ্চ তৈরী করছে। সকাল হলেই ছুটে আসতাম দেখতে—কতদূর কাজ এগিয়েছে।

নয়াবাড়ীর বিল হচ্ছে গাঁয়ের ঠিক মাঝখানে। একদিকে গাঁয়ের পোষ্ট অফিস—একদিকে মুন্সীবাড়ী, আর একদিকে নয়াবাড়ী। গ্রীষ্মের সময় শুক্‌নো খট্‌খটে থাকে—কিন্তু বর্ষার জল এলে তার চেহারা হয়ে যায় অন্য রকম। এই বিলের মধ্যে বেরোয় নৌকো-মিছিল—আর হয় নৌকো-বাচ্‌। আশে-পাশের আট-দশটি গ্রামের লোক এই শ্রাবণ-

সংক্রান্তির উৎসব দেখ্তে হুম্ড়ি খেয়ে পড়ে। পোষ্টাপিসের সাম্নে, মুন্সীবাড়ীর নহবৎ খানায়, আর নয়াবাড়ীর প্রাঙ্গণে লোক ধরে না। সেখানে একেবারে মেলা বসে যেত। কত দোকান-পশার বসত। চিনির সাজ—ফেণী বাতাসার দোকান, রঙ-বেরঙের খেল্নার দোকান, জিলিপির দোকান, হাঁড়ী কলসীর দোকান, বাসন-কোসনের দোকান··· আরো কত কি! বিকি-কিনিও নেহাৎ কম হত না!

নৌকো-বাচে যে দল জিততো তাদের আবার ইনাম দেয়া হত। এই ব্যাপারে সারা গাঁয়ে এমন একটা হুলুস্থুল পড়ে যেত—যে কোলের ছেলেদের অবধি নিয়ে মায়েরা এসে দাঁড়াতো এই বিলের ধারে।

টোনা ঠাকুর আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। এক সঙ্গে ইস্কুলে পড়তাম আমরা। এই টোনা ঠাকুর ছিল তখন পল্লী-কবিদের নেতা। মুখে মুখে ছড়া রচনা করতে পারত। শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে টোনা ঠাকুর প্রচুর ছড়া আর কেচ্ছা লিখে দিত। উৎসব শেষ হয়ে যাবার পরও এই নিয়ে কত যে আলোচনা, আর রেষারেষি চল্ত—তার সীমা নেই!

একবার সুরেশ রায় প্রভৃতি কয়েকটি ছেলে এই শ্রাবণ সংক্রান্তির উৎসবে সখি সেজেছিল। পরদিন ইস্কুলে ছেলের দল তাদের ঠাট্টা করে কোণঠাসা করে রেখেছিল। মাষ্টার মশাইদের কাছ থেকেও এজন্য ওরা খুব বকুনি খেয়েছিল বলে মনে পড়ে!

এই শ্রাবণ-সংক্রান্তির ব্যাপার নিয়ে আমার হয়েছিল উভয় সঙ্কট। যদি পূবপাড়া জেতে—তবে মামাবাড়ীর দল হেরে যায়! আর যদি পশ্চিমপাড়া জয়মাল্য লাভ করে তবে আমার মুন্সীবাড়ীর দল হেরে যায়। যে পক্ষই হারুক—আমার হার হবেই।

কাজেই নৌকো-বাচে ছেলেবেলায় আমার দুশ্চিন্তার অবধি থাকৃত না!

তবুও আজ সেই ভুলে যাওয়া ছেলেবেলাতেই মন ফিরে যেতে চায়—মন-পবনের নাওয়ের দাঁড় বেয়ে।

কে হারবে, কে জিত্বে আজ সেটা বড় কথা নয়···সেই মধুর আর

উচ্ছল পরিবেশ, সেই অনাবিল আনন্দ জীবনে আর খুঁজে পাবো না—সেইটেই আক্ষেপের কথা !

ছেলেবেলায় যাদের পল্লী অঞ্চলে কেটেছে—প্রহ্লাদের 'ক' অক্ষরে কৃষ্ণনাম মনে আসার মতো—ভাদ্র মাসের কথা উঠতেই তাদের মনে জাগে তালের বড়ার কথা। আর সঙ্গে সঙ্গে রসনা লালাসিক্ত হয়ে ওঠে।

ঘন ক্ষীর দিয়ে তালের বড়া খেতে কেমন লাগে—সে কথা ত' এখন ভুলেই গেছি! আর খেলেও বোধ করি হজম করা যাবে না !

সেই জন্মাষ্টমীর উৎসব—'তালের বড়া খেয়ে···নন্দ নাচিতে লাগিল' ভাদ্র মাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে পল্লীর মাঠে, ঘাটে, বাটে কত গান, কত কথা কত সঙ্কীর্ত্তন !

নিঝুম তুপুরে বটের ছায়ায় বসে রাখাল ছেলেরা বাঁশী বাজায়। ঝির-ঝিরে হাওয়া সেই বাঁশীর সুরকে ভাসিয়ে নিয়ে আসে। সে সুরও ত' কৃষ্ণের কথাই মনে করিয়ে দেয় !

কান পেতে শুন্‌লে এখনো কি শোনা যায় না ?

ছেলেবেলায় কত কৃষ্ণলীলা যাত্রা শুনেছি—আর রাত্তিরে শুয়ে যখন ঘুম আস্‌তো না—লুকিয়ে কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছি।

ছেলেবেলায় বড়মামার ছেলে ছোক্কন খুব কৃষ্ণভক্ত ছিল। একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি সংগ্রহ করেছিল। ঘরের দরজা বন্ধ করে পুজো করত আর এখান-ওখান থেকে খাবার জোগাড় করে কৃষ্ণকে নৈবেদ্য সাজিয়ে দিত। পূজোর পর চল্‌ত প্রসাদ বিতরণ।

কি করে লুকিয়ে মধুবনে যাওয়া যায়—এই নিয়ে ছোক্কনের সঙ্গে প্রায়ই পরামর্শ হত। মধুবনে গেলে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাওয়া যাবে—এই ছিল আমাদের তুজনেরই ধারণা।

আমাদের শিশুমনের সেই চির-বসন্ত-বিরাজিত-মধুবন—বাস্তবের কঠিন আঘাতে কোথায় যে ভেঙে গুড়িয়ে হারিয়ে গেছে—আজ খবরের

কাগজে 'হারানো-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের' কলমে বিজ্ঞাপন দিয়েও তার হদিশ পাওয়া যাবে না!

মামাবাড়ীর উঠোনে একটা শিউলী গাছ ছিল। তাতে যখন ফুল ফুট্‌তে সুরু করত—আমরা বল্‌তাম—পূজো-পূজো গন্ধ কয়।

পল্লী অঞ্চলের পূজোর সঙ্গে এমন স্বপ্ন মিশে রয়েছে—যে তাকে ভোলা সহজ নয়। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তার আনন্দের রেশ কানে আর প্রাণে ধ্বনিত হতে থাক্‌বে।

আগেই বলেছি—আমাদের গ্রামটি ছোট হলে কি হবে? প্রত্যেকটি বাড়ীতে তখনকার দিনে ছুর্গোৎসব হত। আর হত বেশ সমারোহ করে। তার কারণ ছিল এই যে, প্রায় প্রত্যেকেরই জমিদারী ছিল। অনেকে বিদেশ থেকে প্রচুর উপার্জ্জন করে নিয়ে আস্‌তেন। পূজোর সময় সবাইকার দেশে আসা চাই-ই।

কল্‌কাতা থেকে, দিনাজপুর থেকে, খুলনা থেকে, ঢাকা থেকে দলে দলে লোক দেশে ফিরে আস্‌তেন। নৌকো বোঝাই জিনিস-পত্তর। যেদিন যে বাড়ীতে লোক আসত—একেবারে মহোৎসব সুরু হয়ে যেতো।

পূজোর বহু আগে থেকেই আমরা একটা জরুরী কাজ নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত থাক্‌তাম। ছেলেমেয়েদের এই কাজে উৎসাহের অন্ত ছিল না।

তখনকার দিনে পূজোর ছু মাস আগে বিভিন্ন হাট থেকে সস্তায় পাঁটা কেনা হত—ছুর্গাপূজায় বলি দেবার জন্যে। প্রত্যেক বাড়ীতে অঢেল যায়গা—প্রচুর তাজা ঘাস। পাঁঠার দল এই নরম কচি ঘাস খেয়ে 'গোকুলে' বলির জন্যে বাড়তে থাক্‌ত। যখন সত্যি বলি দেয়া হত পাঁঠাগুলোর চেহারা হত দিব্যি বড়-সড় আর নধর। বলিতে ভক্তিও দেখানো হত আর দক্ষিণ হস্তের কাজটাও অতি চমৎকারভাবে চল্‌ত। যাকে বলে একেবারে রথ দেখা আর কলা বেচার কাজ।

এই পাঁটাগুলি এক-একটা এক-একজনের নামে চিহ্নিত থাক্‌ত।

ছুটি শিংয়ের মাঝখানে যেটার সাদা দাগ সেটা ছোক্কনের, কুচকুচে কালোটা—ছা' মাসির, সাদা কালো মেশানোটা আমার, শিং ছুটো যার বড় সেটা বদন দাদার, পায়ের কাছে যেটার সাদা দাগ সেটা দাদার! এইভাবে আগে থেকেই সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যেত।

প্রত্যেকটি পাঁঠার গলায় দড়ি, আর সেই দড়ির সঙ্গে বাঁধা একটী করে খুঁটী। প্রতিদিন নিজ নিজ পাঁটা 'গোছর' (গোচর) দেয়া আবার তাকে সন্ধ্যেবেলা এনে ঘরে পৌঁছে দেয়া—একটা মস্ত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ।

যতক্ষণ ওরা ঘাস খাবে—আমরা পাশে-পাশে থাক্তাম—আর নিজ-নিজ পাঁটার গুণগান করতাম।

—আমার পাঁটাটা কেমন চমৎকার ঘাস খাচ্ছে দেখেছিস?

—হুঁ! ভারী তুই দেখাচ্ছিস! আমার শিং দেখেছিস?

—অ্যাঁ! তোর শিং নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে খুব খানিকটা হাসির ধূম পড়ে যেত!

—আমারটা কেমন হাঁচি দিতে পারে মানুষের মতো!

হ্যাঁ! হয়ত চেষ্টা করলে পড়াশুনা করতে পারে, চিঠি লিখ্তে পারে—ইস্কুলে যেতে পারে—বই-শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে!

আবার হাসির হুল্লোড়!

পাঁটাগুলি মাঝে মাঝে কচু গাছের জঙ্গলে গিয়ে ঢুক্‌ত, তখন ওদের গায়ে জোক ধরত।

এই জোক ছাড়ানোটা ছিল আমাদের একটা মজার কাজ। প্রথমে কাঠি দিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করতাম। তারপর ছুটে বাড়ীর ভেতর চলে যেতাম—নুন আন্‌বার জন্যে।

সেই নুন ছড়িয়ে দিতাম জোকের গায়ে। যখন ওগুলি কুঁক্‌ড়ে যেত তখন কাঠি দিয়ে পাঁটার গা থেকে ফেলে দিতে আর এতটুকু অসুবিধে হত না!

পূজোতে সব চাইতে প্রলোভনের জিনিস ছিল নতুন জামা, কাপড়, জুতো। এর জন্যে আমরা কবে থেকে যে দিন গুণতে সুরু করতাম

তার ঠিক নেই! জুতোর মাপ দেয়াও ছিল এক মজার ব্যাপার। কাগজের ওপর পা ফেলে তার চারপাশ দিয়ে যখন কয়লা কি পেন্সিল দিয়ে দাগ টানা হত—তখন এমন শির্-শির্ করত যে, তাকে আনন্দের শিহরণ বলে মনে করতাম।

ধুতির বেলা আমাদের ফরমাস দেয়া হত—টাঙ্গাইলের তাঁতের ধুতি। পূজোর বহুদিন আগে থেকেই তাঁতীরা রাশি রাশি সাড়ী আর ধুতি কর্ত্তাদের দেখাতে আন্‌ত। সাড়ীগুলি ক্রমাগত সদরে আর অন্দরে মাকুর মত চালাচালি হত। জমিন পছন্দ হয় ত' পাড় পছন্দ হয় না, আবার পাড় যদি বা চোখে লাগলো, সে জমিন মনোমত নয়।

আমাদের বেলায় কিন্তু ধুতির ফরমাস দিতেই হত। কেননা—অত ছোট ধুতি তাঁতীরা বোনে না। কাজেই বিশেষভাবে অর্ডার না দিলে তা পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে দুঃখ করে বলেছেন, তাঁরা ছেলেবেলায় যে জামা পেতেন তাতে কোনো পকেট থাক্‌ত না, ফলে কবিতার খাতা, পেন্সিল, মার্ব্বেল, লাট্টু প্রভৃতি রাখার ভারী অসুবিধে হত! আমাদের অবশ্য সে অসুবিধেয় পড়তে হয় নি। কোটই হোক্ আর সার্টই হোক—তিনটে করে পকেট চাই-ই। নইলে সবাইকার মুখ-ভার!

ছোক্কন আবার যত রাজের ছেঁড়া কাগজ, আর কুড়োনো জিনিস তার পকেটের মধ্যে জমা করত এবং সেগুলিকে মহামূল্যবান বস্তু বলে মনে করত।

পূজোর সময় নতুন জুতো পায়ে দিয়ে, নতুন ধুতি আর জামা পরে যখন বাড়ী-বাড়ী ঠাকুর দেখতে বেরুতাম—তখন পা চল্‌ছে কি জুতো এগুচ্ছে সেটা একটা সমস্যার বস্তু হয়ে দেখা দিত। নতুন চক্‌চকে জুতো সবাইকে দেখাতে হবে। কাজেই এমনভাবে পা ফেল্‌তে হবে যাতে জুতোর চাকচিক্য সক্কলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খানিকক্ষণ ওইভাবে পদচারণার পর পায়ে পড়ত ফোস্কা! তখন আবার জুতো চরণযুগল ছেড়ে করপল্লবে প্রমোশন পেতো।

পায়ের ফোস্কা ক্রমশঃ লুচির মতো ফুলে উঠ্ত, ফলে পূজোর বাকি কটাদিন নবপাতুকা আর চরণযুগলের সঙ্গে মিতালি পাতাতে পারত না!

কোঁচা তুলিয়ে তখন খালি পায়ে কাদা লাগিয়েই চল্ত আমাদের বাড়ী বাড়ী প্রতিমা দর্শন!

কিন্তু পূজোর আগে প্রতিমা নির্ম্মাণের ব্যাপারই কি আমাদের কাছে কম বিস্ময়ের বস্তু ছিল?

কাঠামো তৈরী থেকে দিন-দিন আমাদের অবাক হবার পালা।

গ্রামের সব বাড়ীতে—লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ নিয়ে পুরো প্রতিমা, শুধু মামী বাড়ীতেই তৈরী হত—তিন পুতুলের প্রতিমা—তুর্গা, অসুর, সিংহ।

প্রথমে কাঠ আর বাখারী দিয়ে মূল-খাঁচাটা তৈরী করা হত। প্রত্যেক বাড়ীতেই খুব বড় বড় প্রতিমা তৈরী হত বলে—কুমোর বাড়ীতে প্রতিমা তৈরী করা সম্ভবপর হত না। বিভিন্ন বাড়ীতে এসে কুমোরদেরই মূর্ত্তি তৈরী করতে হত।

কাঠামো তৈরীর পর হচ্ছে 'জরা বাঁধা'।

খড় দিয়ে আর দড়ি জড়িয়ে যে মূর্ত্তি তৈরী হয়—তাকে বলে জরা বাঁধা। এই জরা বাঁধার সময়ই ছেলেমেয়েদের মধ্যে হুল্লোড় সুরু হয়ে যায়!

—সিংহ এবার অসুরের কোন্ যায়গাটা কাম্‌ড়ে ধরবে রে?

—মাথা, হাত, না হাঁটু?

প্রশ্নে-প্রশ্নে কুমোর ভায়া ত' অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

—মা তুর্গা অসুরকে ত' ত্রিশূল দিয়ে খোঁচা মারবে।

—এই খোঁচাটা অসুরের গায়ের কোন যায়গাটায় এসে বিঁধবে?

প্রথমে শুধু জিজ্ঞাসা আর আলোচনা। তারপর তর্কাতর্কি। তার পরই হাতাহাতি।

কুমোর ভায়া মারামারি থামিয়ে দিত।

তারপর মৃদু হাস্যে বলত, আরে, সবুর কর না, সব দেখ্তে পারবে। মিছি মিছি কিলোকিলি করে লাভ কি?

ছেলেমেয়ের দল শান্ত হয়ে আবার গুছিয়ে বস্ত। কুমোর ভায়ার কথা তখন তাদের কাছে বেদ-বাক্যি।

স্বয়ং ব্রহ্মার চাইতে বড় স্রষ্টা সে!

এই প্রতিমা তৈরীর কাজ এগিয়ে যেতো আর উল্লসিত হয়ে উঠ্ত ছেলে-মেয়েদের মন।

জরা থেকে মাটি, মাটি থেকে রঙ্।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনও রঙীন হয়ে উঠ্ত।

—সিংহের মুখের ভেতরটা কি রকম লাল দেখেছিস?

—অত অসুরের রক্ত খেলে আর লাল হবে না?

—উঃ! অসুর বেটা কেমন চোখ পাকিয়েছে দেখছিস? ওর চোখের কোণটাও টক্‌টকে লাল! ও বেটাও খুব রেগে গেছে!

—রেগে গেছে ত' বয়েই গেল! মা-দুর্গার ত্রিশূলের খোঁচা যখন খাবে—তখন বুঝ্বে মজাটা!

তর্কাতর্কি থেকে শেষ পর্য্যন্ত দুটো দলে দাঁড়িয়ে যেত। একদল সিংহের পক্ষে—আর একদল অসুরের।

—হুঁ! অসুরের জোর কি সোজা?

—তাই বলে মা-দুর্গার সঙ্গে আর পারতে হবে না!

—কী যে বলিস! দু'জনে মিলে একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে—তাতে আবার বাহাদুরী কি?

—মা-দুর্গার সঙ্গে আর চালাকিটি নয়! দেবতারা সব বাছা বাছা অস্ত্র মা-দুর্গার হাতে তুলে দিয়েছেন।

—তাও ত' অসুরের সঙ্গে পেরে ওঠে না! কত হাজার বছর শূন্যে চুলের মুঠি ধরে ঘুরিয়েছিল তা জানিস্?

ঠাকুমা-দিদিমাদের কাছ থেকে যে যা চণ্ডীর গল্প শুনেছে—ঝগড়ার সময় কাজে লাগাতে সুরু করল।

এদিকে ছেলে মহলে চলেছে কথা কাটাকাটি আর কুমোর ভায়া ক্রমাগত হাত চালিয়ে যাচ্ছে।

আবার অন্যান্য বাড়ীর প্রতিমাও ফাঁকে ফাঁকে দেখে আসা চাই।

—আরে, গৌরচন্দ্র ঠাকুরের বাড়ীর অসুরটা দেখেছিস? যেন একেবারে জ্যান্ত দানব।

—সেনেদের বাড়ীর লক্ষ্মী-সরস্বতীর মুখ কিন্তু ভারী সুন্দর হয়েছে—ও-রকম আর কেউ পারে না!

—মুন্সীবাড়ীর প্রতিমাও খুব ভালো হয়েছে। আমি কাল কাকার সঙ্গে গিয়ে দেখে এসেছি।

কিন্তু প্রতিমা তৈরীর কাজে সবার ওপর টেক্কা দিতেন আমাদের সুরেশদা। পূর্ণ সেন মশায়ের ছেলে সুরেশ সেন।

বয়েসে আমাদের চাইতে অনেক বড়। ওঁর বড় ছেলে রামা আমাদের বন্ধু।

শিল্প আর কারু-শিল্পের কাজে সে অঞ্চলে সুরেশদার জুড়ি কেউ ছিল না। স্থানীয় কুমোররাও তাঁর কাছ থেকে শিখ্‌তে পারত।

অপূর্ব্ব প্রতিমা তৈরী করতেন তিনি।

সাতখানা গাঁয়ের লোক তাঁর হাতের তৈরী প্রতিমা দেখ্‌তে আস্‌ত। শুধু প্রতিমা তৈরীই নয়—মণ্ডপ তৈরীর কাজেও তিনি অভিনব কারু-শিল্পের পরিচয় দিতেন।

গ্রামের তরুণদল অভিনয় করবে? সেখানে সকলের আগে ডাক পড়ত সুরেশদার। মঞ্চসজ্জায় তিনি যে অভিনবত্ব দেখাতেন তা গ্রাম দেশে ত' দুর্লভ ছিলই, কল্‌কাতার সাধারণ মঞ্চেও তার জুড়ি পাওয়া যেত না! একবার গ্রামের যুবকবৃন্দ 'সাজাহান' অভিনয় করেছিলেন। তাতে সুরেশদা ময়ুর সিংহাসন তৈরী করে দেন। এখনও তা ছবির মতো চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে। কল্‌কাতার সাধারণ রঙ্গাল্‌য়েও সে-রকম ময়ুর সিংহাসন কোনো দিন চোখে পড়েনি।

এই মানুষটি যদি কোনো স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করতেন—তবে

সিনেমা-রাজ্যে খ্যাতিমান "আর্ট-ডিরেক্টর" হতে পারতেন—এ কথা আজ আমি সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌তে পারি।

সুরেশদা নিজে খুব ভালো অভিনয়ও করতে পারতেন। সাধারণতঃ হাস্য-রসাত্মক অভিনয়ে তাঁর খ্যাতি ছিল। একবার বিল্বমঙ্গল নাটকে তিনি ভণ্ড সাধুর অভিনয় করেছিলেন। তারপর থেকে সারা গাঁয়ের ছেলের দল ফেউয়ের মতো তাব পেছনে লেগে থাক্‌ত। তিনি কৌতুকের সঙ্গে তাদের আবদার সব সময়ে রক্ষা করে চল্‌তেন।

আবার এই সুরেশদাই কিছুকাল সাকরাইল মাইনর স্কুলের শিক্ষকতা করেছিলেন। তখন আমরা তার কাছে পড়েছি। ইংরেজী শেখাবার একটি নিজস্ব ধরণ ছিল তার। তার কাছেই প্রথম ইংরেজী অনুবাদ করতে শিখি।

এই সুরেশদার শ্রাদ্ধের কথা কোনো দিনই মন থেকে মুছে যাবে না। পরবর্ত্তীকালে তিনি কল্‌কাতার শহরতলী কস্‌বা অঞ্চলে এসে বসবাস করতেন। শেষ জীবনে তিনি বেশ কিছুদিন ধরে ভুগ্‌ছিলেন।

হঠাৎ একদিন তার বড় ছেলে আমাদের বন্ধু রামা এসে হাজির আমার শ্যামবাজারের বাসায়। সুরেশদা মারা গেছেন—এবং তার শ্রাদ্ধের সমস্ত কিছু ব্যবস্থা তিনি নিজেই করে গেছেন। শ্রাদ্ধের খরচ পৃথক ভাবে সঞ্চয় করে রেখে গেছেন। তাঁর শ্রাদ্ধে কাকে-কাকে নেমন্তন্ন করতে হবে নিজের হাতে ফর্দ্দ তৈরী করে রেখে গেছেন। এমন কি শ্রাদ্ধে কি-কি রান্না হবে—তারও তালিকা করে যেতে তিনি ভোলেন নি! এই সব জিনিস আবিষ্কৃত হয় তাঁরই মৃত্যুর পর।

এমনি অদ্ভুত মানুষ ছিলেন সুরেশদা।

সুরেশদার কথা বল্‌তে বল্‌তে পথ ছেড়ে চলে এসেছি।

আবার আমরা গ্রামে ফিরে যাই।

পূজোর সময়কার কথাই বল্‌ছিলাম।

গ্রামের পূজোর সময়কার কথা—তীর্থবাসী পণ্ডিত মশায়ের কথা ছাড়া ভাবা যায় না।

গ্রামের মাইনর বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে মাইনে খাতায় লেখা

থাকে, সই করে নিতে হয় তার চাইতে অনেক কম। ইস্কুলটা গ্রাম-বাসীদের চাঁদায় চলে। আর সে চাঁদা আদায় করবার ভার আমাদের পণ্ডিত মশায়ের ওপর। পূজোর আগে যা' কিছু এইভাবে আদায় হয় সবাইকে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়ে পণ্ডিত মশায়ের নিজের ভাগে পড়ল হয়ত সাত টাকা বারো আনা মাত্র। হাসি মুখে তাই ট্যাঁকে করে তিনি নিজের বাড়ী যাওয়া স্থগিত রেখে আর সব শিক্ষকদের দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। বাড়ী থেকে ছেলে বাপকে দেশে নিয়ে যেতে এসে চোখ ছল্ ছল করে ফিরে গেল!

তীর্থবাসী পণ্ডিত কি এসময় দেশে যেতে পারেন?

ইস্কুল হচ্ছে পণ্ডিত মহাশয়ের বুকের পাঁজর। তিনি ভালো রকমই জানেন যে, বিদেশ থেকে গাঁয়ের উপার্জ্জনশীল লোকেরা এই পূজোর সময় গ্রামে ফিরে আস্‌বেন। এই ছুটিতে তাঁদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করতে হবে। নইলে ইস্কুল উঠে যায়! এ কাজ আর কে করবেন—তীর্থবাসী পণ্ডিত ছাড়া?

গোটা গ্রাম যখন পূজোর উৎসবে মত্ত—তখন এই পণ্ডিত কারো একটা ছোট্ট ডিঙি নৌকো চেয়ে নিয়ে তাতে সেই চির-পুরাতন, চির-পরিচিত তালিমারা ছাতা মাথায় বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছেন—চাঁদা সংগ্রহের জন্যে।

ওদিকে ঢাকের বাদ্যি বেজে উঠেছে সব বাড়ীতে। চকের বাড়ী, নয়াবাড়ী, পুরাণ বাড়ী, মুন্সীবাড়ী, সেনবাড়ী, ঠাকুর বাড়ী, পূর্ববাড়ী, দক্ষিণ বাড়ী, পশ্চিম বাড়ী, দত্তবাড়ী···কোথায়ও বাদ নেই। খাল আর পুকুরের ভেতর দিয়ে, ঢেউ খেলানো ধান ক্ষেতের ওপর দিয়ে সেই বাদ্যি আশে-পাশের সাতখানা গাঁয়ে শোনা যাচ্ছে!

তখনকার দিনে অর্থে আর সামর্থ্যে ছিল প্রাচুর্য্য। তাই পূজোর সময় শুধু পাঁটা বলিতেই অনেক বাড়ীর কর্ত্তারা খুশী থাক্‌তেন না। মোষ বলি দেবার ব্যবস্থাও ছিল কোথাও-কোথাও।

বলি দেবার আগে মোষটাকে নিয়ে চলতো তাণ্ডব ব্যাপার। একদল লোক ছিল যারা মোষকে নানাভাবে উত্তেজিত করে

তুলতে পারত—ভাঙ্ খাইয়ে, ধুত্রোর ফল খাইয়ে,—আরো নানা ভাবে।

এই মোষবলি দেখ্বার জন্যে চতুর্দ্দিক থেকে এসে লোক জড় হত। তা ছাড়া গাঁয়ের প্রত্যেক বাড়ীর ঢাক একত্র করা হত—যেখানে মোষ বলি হবে।

সেই সমবেত ঢাকের শব্দে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। শুনতে পাই—যারা মোষ বলি দিত—তারাও রীতিমত ভাবে গাঁজা টেনে টং হয়ে নিত।

বলি দেবার আগে এক ঘণ্টা ধরে চলত সেই মোষটাকে নিয়ে ধস্তাধস্তি!

ওটা নাকি মোষ বলির প্রাথমিক পর্ব্ব।

টক্টকে জবা ফুলের মালা গলায় দিয়ে, কপালে ইয়া মোটা সিঁদুরের ফোঁটা পরে একদল লোকের একেবারে টাগ্-অফ্-ওয়ার সুরু হয়ে যেতো।

মোষটা রাগে ফোঁস-ফোঁস করতে থাকৃত আর চার পায়ের দাপটে মাটিতে গর্ত্ত করে ফেলত! তখন ওর পায়ে ফাঁস লাগিয়ে দেয়া হত। সেই দড়ি ধরে টানা-টানিতে একটা পৈশাচিক উল্লাস ফুটে উঠ্‌ত! মোষটা প্রাণপণে চেষ্টা করত দাঁড়িয়ে থাকবার, আর এই লোকজনরা দড়ি ধরে টেনে-হিঁচ্ড়ে—শেষ পর্য্যন্ত জানোয়ারটাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলতো।

তারপর মোষটাকে হাঁড়িকাঠে ফেলা নিয়েই কি তাকে কম হেনস্তা?

তখন সুরু হয়ে গেছে—মোষটার মাথায় ক্রমাগত জল ঢালা। মোষটা এতক্ষণ· যুঝে হাঁপিয়ে পড়েছে। জিব বের করে কেবলি জল খাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে! কতটুকু পেটে যাচ্ছে সে-ই জানে!

যে বলি দেবে মালকোঁচা মেরে "জয়-মা দুর্গা" বলে—ঘন-ঘন সে-কী হুঙ্কার দিচ্ছে!

মোষ বলির পর—সেই সিদ্ধি খাওয়া লোকের দল যেভাবে রক্ত

মাটি থেকে তুলে চারদিকে ছড়িয়ে দিত—সে বীভৎস দৃশ্য দেখে সত্যি মন শিউরে উঠ্‌ত। অনেক মেয়ে-ছেলে ছুটে এসে বাটি করে মোষের রক্ত তুলে নিয়ে যেত। কেন নিতো তারাই জানে।

মহিষাসুর বধের সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য ছেলেবেলায় দেখেছি—কিন্তু আজও ভুলতে পারিনি।

পূজোর কটাদিন শুধু আনন্দ-হুল্লোড় আর খাওয়া-দাওয়া। গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ী তখন নিজের বাড়ী হয়ে যেতো। কোনোখানে কোনো সঙ্কোচ নেই। যাও—পাত পেতে বসে পড়ো,—মজা করে খেয়ে এসো।

পূজোর বহু আগে থেকেই গাঁয়ের ঠাকুরমা-দিদিমা আর বৌঝিরা নারকেল নাড়ু, চিড়ে-জিড়ে, ঢ্যাপের মোয়া, মুড়ির মোয়া, চিড়ের মোয়া, চন্দ্রকাট্, অবাক-সন্দেশ, আম-সন্দেশ, ক্ষীরের তক্তি, মণ্ডা মিঠাই তৈরী করে রাখ্‌ত—আর ছেলের দল তাতে কেবলি ভাগ বসাতো।

যারা দিত তাদেরও আনন্দ—আর যারা খেতো তাদের ত' কথাই নেই!

এত আনন্দ আকাশে-বাতাসে—মানুষের সহজ ব্যবহারে ছড়িয়ে ছিল যে শুধু কুড়িয়ে নিলেই হল।

আর হবেই বা না কেন? সারাটা গাঁয়ে—ঠাকুমা, দিদিমা, পিশিমা, মাসিমা, জেঠিমা, বৌঠাক্‌রুণের একেবারে ছড়াছড়ি! আমাদের ছেলেবেলাকার গ্রামের কথা মনে হলে—রবীন্দ্রনাথের দুটি লাইন আপনা থেকেই গুন্‌-গুন্‌ করে মনে জেগে ওঠে—

"নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুসি—
যে-পথ দিয়া চলিয়া যাবো—সবারে যাবো তুষি!"

এই যে সবাইকে আপন করে নেয়ার উৎসব—আমরা তাই পেয়েছিলাম ছেলেবেলাকার গ্রাম্য-জীবনে।

এত আনন্দের মধ্যেও প্রতিদিন বিকেলবেলা "নৌকো-বিহার" ছিল আমাদের আর একটি মনের মতো উৎসব!

এই মধুর-অভিযানের জন্যে আমরা সারাটি দিন অসীম পুলকে অপেক্ষা করে থাক্‌তাম।

আমাদের দলটি ত' নেহাৎ কম ছিল না। তাই ছুটি নৌকোর প্রয়োজন হত—সবাইকে কুলিয়ে উঠতে।

প্রত্যেকের হাতে থাক্‌ত একটি করে বৈঠে। সার দিয়ে সবাই বসতাম। ডাইনে আর বাঁয়ে পড়ত আমাদের বৈঠে। হাল ধরা থাক্‌তো পেছনে।

কলকলে স্রোতের জল। কণ্ঠে জাগত গান। আমরা গাইজা-বাড়ীর খাল দিয়ে নৌকো চালিয়ে দিতাম। চকের বাড়ী রইল বাঁ-হাতে। ওই ত' ডান হাতে একটু দূরে ঈশান ঘোষের চিতার ওপর মঠ।

নৌকো আমাদের তর্ তর্ করে এগিয়ে চলেছে—

এই সময় ছুটো গান আমরা প্রায়ই গাইতাম—একটি গান ছিল—

"সম্মুখে রাঙা মেঘ করে খেলা
তরণী বেয়ে চলো নাহি বেলা॥"

আর একটি গান হচ্ছে—

"আমি ভয় করবো না—
ছু-বেলা মরার আগে মরবো না!
তরীখানি বাইতে গেলে—
মাঝে-মাঝে তুফান মেলে—
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে—
কান্নাকাটি করবো না।" ইত্যাদি—

ডানদিকে ধানের ক্ষেতে এলোমেলো হাওয়া বইছে। পশ্চিম আকাশে রঙীন মেঘের মেলা, একতালে পড়ছে আর উঠ্‌ছে আমাদের এতগুলি বৈঠে—আর কণ্ঠে আমাদের সমবেত-সঙ্গীত।

মনে হত—এই কি স্বর্গ-সুখ নয়?

যদি স্বর্গ কোথায়ও থাকে ত' এইখানে—এইখানে—এইখানে।

সেই যে পাঁটার দল—যাদের আমরা এতদিন ধরে ঘাস খাইয়ে এত বড়টি করেছি—তাদের এক-এক জনের এক-এক দিন পালা পড়ে—বলির জন্যে।

সেই মহাভারতের বক রাক্ষসের গল্প।

যেদিন যে বাড়ী থেকে লোক পাঠাবার পালা পড়ে—একেবারে মরা কান্না সুরু হয়ে যায়—সেখানে। এখানেও ঠিক তাই। যেদিন যার পাঁঠা বলি হবে ঠিক হয়—তার মুখ যায় শুকিয়ে। আরও একটা মজার ব্যাপার ঘটে। যার পালা-পাঁঠা যেদিন বলি হয়—সে আর সেদিন মাংস খায় না! অন্যের পাঁঠার মাংস খাবে—কিন্তু নিজেরটা নয়! সেদিন তার শোকের দিন যে! শুধু কি তাই? সেদিন সে বলির সময়ও উপস্থিত থাক্‌বে না সকাল থেকেই তার আর টিকি দেখ্‌বার যো থাকে না!

বলির পশুর ব্যাপারে আরও একটা প্রথা আছে।

যদি বলির মধ্যে কোনো খুঁত্ খুঁজে পাওয়া যায় তবে আর তাকে কোনো মতেই বলি দেয়া চল্‌বে না! সেই বিশেষ পাঁঠাটি তখন বাতিল হয়ে যাবে।

যদি কারো ভাগ্যক্রমে তার পালিত-পাঁঠাটির কোনো খুঁত বেরিয়ে পড়ে আর বলির ব্যাপারে বাতিল হয়ে যায় তবে সেদিন তার আনন্দ দেখে কে!

মনে হয়—সে যেন বিশ্ব জয় করে ফেলেছে!

লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে—নেচে-কেঁদে সে একেবারে হুলুস্থুল বাঁধিয়ে ফেলে!

এই রকম সুযোগ যে হামেশা আসে—তা কিন্তু নয়!

প্রতি বছর নবমীর দিন মামাবাড়ীতে গ্রামস্থ লোকের নিমন্ত্রণ হত। বড় মামা লোককে খাওয়াতে বড় ভালোবাস্‌তেন। সেদিন বাড়ীর বৌদের মধ্যে একেবারে প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে যেতো—কে কত রক-মারী খাবার তৈরী করতে পারে। এমনি ভাত-ডাল-তরী-তরকারী-

মাছ-মাংস-পাচকে রান্না করত ; কিন্তু রকমারী পিঠে-পায়েস ইত্যাদির ভার পড়ত বৌদের উপর।

লম্বা সার দিয়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে নিমন্ত্রিতদের, ক্রমাগত খাবার আস্‌ছে—পদ আর শেষ হয় না!

,আমাদের দেশে চম্‌চম্ ছিল—বিখ্যাত।

সকলের শেষে যেই বড় বড় রসনা তৃপ্তিকর চম্‌চম্ পাতে পড়তে থাক্‌তো।

সেকালে গ্রামে দেখেছি নেমন্তন্ন বাড়ীতে যে যত পদ করতে পারবে—তাঁর তত নাম!

শাক্—তাই তিন-চার রকম। ডাল? মুগের ডাল, মটরের ডাল, ডাল, ছোলার ডাল—! এই ভাবে পদ যেত বেড়ে। শেষকালে যখন মিঠাই-মণ্ডা-পায়েস আস্‌তে থাকত···সবাই আক্ষেপ করে বল্‌ত—আহা-হা! কেন আগে ভাত বেশী খেয়ে ফেলেছি!

নবমীর পর বেজে উঠ্‌তো বিসর্জ্জনের বাজ্‌না।

এইবার সব বাড়ীর মণ্ডপ খালি হয়ে যাবে।

গাঁয়ের বৌরা রাত জেগে পান সেজেছে, বরণ ডালা সাজিয়েছে—, মাতুর্গাকে বরণ করে এক বছরের মতো বিদায় দেবে বলে!

ঘাটে-ঘাটে বড় বড় নৌকা ভাড়া করা হয়েছে—তারই ওপর প্রতিমা তুলে নিয়ে "আরঙে" যেতে হবে।

টাঙ্গাইলের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে যে লৌহজঙ্গ নদী—সেইখানে হবে আরঙ্—নদীর তু'পাশে বস্‌বে—বিরাট মেলা—নৌকোয়-নৌকোয় ছেয়ে যাবে সারাটা অঞ্চল।

নৌকোগুলো সাজানো হয়েছে, আগা-গলুই আর পাছা গলুই-এ ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে ফুলের মালা, লেপে দেয়া হয়েছে তেল্ সিঁন্দুর।

ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে স্রুরু হয়ে গেছে হুল্লোড়!

কে কি রকম জামা কাপড় পরে 'আরঙে' যাবে!

এক-এক বাড়ীর প্রতিমা নৌকোয় তোলা হচ্ছে আর বিসর্জ্জনের বাজ্না শুনেই সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে।

ওই চকের বাড়ীর নৌকা চলে গেল, জগৎ দাসের বাড়ী নৌকো যাবে খাল ঘুরে, পুরাণ বাড়ী, মুন্সী বাড়ী, সেনেদের বাড়ীর নৌকোও একে একে রওনা হচ্ছে। পশ্চিম বাড়ীর নৌকোকেও খাল ঘুরে যেতে হবে। পূব বাড়ীর নৌকোর লগিও এইবার ঘাট থেকে তোলা হয়।

বদর—বদর—বদর—

সারে সারে সব নৌকো এগিয়ে চলেছে, সানাইয়ের তানে বিসর্জ্জনের সুরটি ধরা পড়েছে—নদীর কালো জলে কার ছলো ছলো চোখের ছায়া?

খালের ছুধার দিয়ে হাঁটা পথেও চলেছে বহু লোক—।

পায়ে চলা পথ তাদের ডেকে নিয়ে যাচ্ছে মেলার দিকে।

অনেকে নানা রকম জিনিষ-পত্তর মাথায় আর কাঁখালে করে নিয়ে যাচ্ছে। ওগুলো ওরা মেলায় বিক্রি করবে।

নৌকোর পাশে-পাশে চলেছে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ের দল—বিভিন্ন নৌকোর ওপর তাদের প্রতিমা দেখাও চল্‌ছে, আবার মেলার দিকে এগুনোও হচ্ছে।

ওই ত' মেলার কোলাহল কানে ভেসে আস্‌ছে।

বহু লোক জমে গেছে নদীর ছুধারে।

কেমন সুন্দর করে দোকান সাজিয়েছে ওরা।

ফেনী-বাতাসার দোকান, চিনির সাজের দোকান, তেলেভাজা জিলিপীর দোকান,—এইখানে ভীড় সব চাইতে বেশী। ওদিকে নানা রকম খেল্‌নার দোকান, মশলার দোকান; ওই দেখ, কাঠের তৈরী কত-খেলনা-নৌকো সাজানো রয়েছে সারে সারে। ছেলেদের একটি করে রঙীন নৌকো অবশ্য চাই—নইলে আরঙের মজাই নাকি মাটি!

ভেঁপুবাঁশী কিন্‌বে? তা হলে ঐদিকে যাও—কটা চাই তোমার? ওই যাঃ! বাজাতে গিয়ে ভেঙে ফেললে! তোমার ছোট ভাই কেমন চমৎকার বাজাচ্ছে।

পেয়েছি প্রচুর। আমরা তাঁকে ডাকতাম ছোড়দি বলে। অপূর্ব্ব সুন্দরী ছিলেন তিনি। তাই গরীব ঘরের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও এই জমিদার বংশে তাঁর বিয়ে হওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। দেবী মূর্ত্তির মতো এই ছোড়দির কাছে আমাদের আব্দারের অন্ত ছিল না। নানা রকম খাবার তৈরী করতে পারতেন আমাদের এই ছোড়দি। কত যে ডেকে নিয়ে আমাদের খাওয়াতেন—তা' বলে শেষ করা যায় না। রান্নাতেও তাঁর খুব নাম-ডাক ছিল। আমাদের দেশের নানা রকম মাছের তুলনা হয় না—আর সে মাছের স্বাদও ছিল চমৎকার। ছোড়দির হাতে সেই মাছ আরো মুখরোচক হয়ে উঠত।

ছোড়দি আমাদের নিয়ে খুব হৈ-হৈ করতে ভালোবাস্‌তেন। হয়ত আসর খুব জমে উঠেছে—গল্প, হাসি, গান চলেছে পুরোদমে এমন সময় ছোট আজামশাই এসে হাজির। এক কথায় দু কথায় ছোড়দি ছোট আজামশায়ের সঙ্গে মজার মজার কথা বলে ঝগড়া সুরু করে দিতেন। আমরা প্রায়ই ছোড়দির পক্ষ নিতাম—আর 'নারদ' 'নারদ' করে ঝগড়াটাকে ভালো করে পাকিয়ে তুল্‌তাম। ছোট আজা-মশায়ের দ্বিতীয়া স্ত্রীর মেয়ে আমার সমবয়েসী আর খেলার সাথী। তাকে আমি ডাকতাম ছা'মাসি বলে। এই ছা'মাসির সঙ্গে ছেলে-বেলায় আমার ভারী ভাব ছিল। বড় মামার তৃতীয় ছেলে ছোক্কনও ছিল আমাদের খেলাধূলার সাথী। বড় মামার ছোট মেয়ে মেঘিদিও ছিল আমাদের খেলাঘরের সভ্যা। বয়েসে কিছুটা বড় হলেও সে সাজত আমার খেলাঘরের বৌ। আর ছোক্কনের বৌ সাজতো—ছা'মাসি। খেল্‌তে খেল্‌তে এক-একদিন এমন ঝগড়া সুরু হয়ে যেত যে নিজেদের হাতে-গড়া খেলাঘর নিজেরাই ভেঙে ছড়িয়ে তচ্‌নচ্‌ করে দিতাম! এই ঝগড়ার ব্যাপারে ছা'মাসি আমার পক্ষ নিতো—আর ওরা দুই ভাই-বোন কোমর বেঁধে ঝগড়া সুরু করে দিত।

নতুন নতুন খেলনা পাওয়ার জন্যে আমি সব সময় কল্‌কাতার দিকে তাকিয়ে থাক্‌তাম। মামীর মাকে আগে আমরা চোখে দেখিনি

কিন্তু তিনি যে আমাদের আর একটি চমৎকার দিদিমা—সেটা সব সময়ই খেয়াল থাকত। মামী যখন বাপের বাড়ী কল্‌কাতা থেকে আমাদের ওখানে যেতেন—তখন আমাদের দু' ভায়ের জন্যে নানা রকম খেল্‌না নিয়ে যেতেন। এই জাতীয় খেল্‌না গাঁয়ের লোকেরা কেউ চোখেও দেখেনি—তাই এটা ছিল আমার ভারী গর্ব্বের বিষয়। যখন খেলার সাথীদের সঙ্গে ঝগড়া হত—কল্‌কাতার এই সব রকমারী খেল্‌না দেখিয়ে বাজিমাৎ করে ফেল্‌তাম।

এইবার মামাবাড়ীর মেজ তরফের কথা বলি। মেজ তরফের কর্ত্তা হচ্ছেন মামা। তিনি দেশে খুব কম থাক্‌তেন। আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখেছি—তিনি কলকাতায় থাক্‌তেন। সেখানে কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির কাছে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পড়তেন। ছুটি-ছাটাতে এবং মাঝে-মাঝে যখন দেশে আস্‌তেন—আমাদের জন্যে অনেক জিনিস নিয়ে আস্‌তেন। তাই মামার দেশে আসাটা আমাদের কাছে ছিল—পালা-পার্ব্বণের মতো।

আসলে মেজ তরফের কর্ত্রী ছিলেন আমার দিদিমা। তিনিই সংসারটাকে আগলে রাখতেন—তা ছাড়া গোটা বাড়ীর এজমালী ব্যবস্থা ত' ছিলই। আমার আর এক বিধবা মাসিমা—প্রায়ই আমাদের সঙ্গে থাক্‌তেন। তিনি আমার আপন মাসিমা নন—কিন্তু আপন মাসিমার চাইতেও বোধ করি বেশী ছিলেন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের তিনি নিজের বৌদি। খুব অল্প বয়সে বিধবা হন। এই মাসিমা যেন আমাদেরই আঁক্‌ড়ে ধরে পড়ে ছিলেন। এমন কাজের মেয়ে সে কালে আমাদের গাঁয়ে ছিল না বললেও চলে। খুব তাড়াতাড়ি এমন নিপুণ ভাবে তিনি সব কাজ করতেন যে, কেউ সহজে তাঁর ত্রুটি ধরতে পারত না। আমার মামাবাড়ী যদিও গাঁয়ের পশ্চিম পাড়ায় ছিল—তবু বাড়ীটার নাম কিন্তু ছিল পূব বাড়ী। তার একমাত্র কারণ, এই বাড়ীর পশ্চিমে একটি বিরাট পুকুর ছিল—এবং তার পরেই যে বাড়ীটি তার নাম ছিল পশ্চিম বাড়ী। পশ্চিমের পূবে বলেই বাড়ীটির নাম হয়েছিল পূব বাড়ী। গোটা

গ্রামের লোক তাই পূব বাড়ী বলতে আমার মামাবাড়ীকেই বুঝত।

যে মাসিমার কথা বল্‌ছিলাম—তাঁকে নিয়ে আমার ছেলেবেলায় যে মজার ঘটনাটি ঘটেছিল—এখন সেই গল্পটা বল্‌ছি।

মাসিমা খুব "কম্মা মেয়ে" ছিলেন আগেই বলেছি। প্রায়ই নানা রকম পিঠে-পায়েস করে তিনি আমাদের খাওয়াতেন। এই ব্যাপারে আমার দিদিমার খুব উৎসাহ ছিল—এবং তিনি সুযোগ পেলেই রোজকার বরাদ্দ দুধ ছাড়াও বাড়তি দুধ প্রচুর রাখতেন। মাসিমা ত' একদিন খুব খেটে-খুটে আমাদের জন্যে 'পান্তুয়া' তৈরী করলেন। সেই পান্তুয়া হল যেমন নরম তেমনি সুস্বাদু। লোভে পড়ে বেশ কয়েকটা গপাগপ্ খেয়ে ফেললাম। তার ওপর মাসিমা স্নেহের আধিক্যে কেবলি বলতে লাগলেন—আর দুটো খা—আর দুটো খা—

এমন লোভ ছাড়া মুস্কিল! খেতে খেতে মাত্রা গেল ছাড়িয়ে। তার ফলে আমার হল অসুখ। ক'দিন ধরে সব খাওয়া-দাওয়া একেবারে বন্ধ—যাকে বলে উপোস। কিন্তু বাড়ীর লোকে ত' তাই বলে পেটে কীল মেরে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে বসে থাকে নি! তাঁদের সবাইকার দক্ষিণ হস্তের কাজ আগের মতোই রসালো ভাবে চলতে থাক্‌লো। কিন্তু আমি কিছু খেতে চাইলেই চার দিক থেকে রব ওঠে—না-না কিচ্ছুটি না। তোর যে অসুখ করেছে!

আর কোনো উপায় না দেখে—এইবার আমি ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লাম। সুর করে কান্না সুরু করে দিলাম—"পান্তুয়া খাওয়ালে কেন?" বেশ মনে আছে এই কান্নার সুর কয়েকটা দিন ধরে চলেছিল! এর পরে কোনো একটা ব্যাপার ঘট্‌লেই বাড়ীর লোকে নাকী সুরে আমায় ঠাট্টা করে বলত—"পান্তুয়া খাওয়ালে কেন—?"

আর মাসিমা ক্ষ্যাপাতেন সব চাইতে বেশী।

আমার প্রথম চুরির কথা মনে হলে এখনো হাসি চেপে রাখা মুস্কিল হয়ে ওঠে। সেই কাহিনীই এখন বল্‌ব—

কে যে বুদ্ধি দিয়েছিল ঠিক মনে নেই। কিন্তু প্ল্যানটা যে অভিনব সে কথা আজও ভুল্‌তে পারিনি।

মাছের একটা পট্‌কা কোনো একটা কৌটোর মধ্যে জল দিয়ে জিইয়ে রাখতে হবে। আর তার ভেতর রেখে দিতে হবে একটি আনি। তাহ'লেই না কি পট্‌কার পেট থেকে বেরুবে একটি মাছ।

একটি ছোট পট্‌কা জোগাড় করা শক্ত নয়। কেন না—মাছেরই দেশ। পুকুরের মাছ—বাজারের মাছ—প্রত্যহ বাড়ীতে প্রচুর মাছ এসে থাকে। ঐ রকম কাণ্ড করলে নাকি সেই পট্‌কার ভেতর থেকে একটি মাছ বেরুবে এবং সেটিকে জ্যান্ত অবস্থায় পুকুরে ছেড়ে দেয়া যাবে।

হরি পিশিকে খোসামোদ করে একটি ছোট মাছের পট্‌কা জোগাড় করা গেল। একটি জার্ম্মাণ সিলভারের কৌটোও ছিল আমার ধন-ভাণ্ডারে। এইবার বিপদ ঘনীভূত হল—একটি আনি সংগ্রহ করার ব্যাপার নিয়ে।

এ বাড়ীতে ছোটদের হাতে পয়সা তুলে দেয়া ছিল একেবারে বারণ। একটি আনি এখন কোথায় পাওয়া যায়? একটি গজমতির মালা জয় করে আনতে বললে না হয় স্বপ্নরাজ্য থেকে আহরণ করা যেত। কিন্তু আনি আমার কাছে সত্যি মহার্ঘ আর দুষ্প্রাপ্য।

এখানে ওখানে সেখানে পয়সা ছড়িয়ে পড়ে থাকে না যে, চট্ করে তুলে নেবো। হয়ত দিদিমার মালাজপের থলির মধ্যে মিল্‌তে পারে। কিন্তু সেটা ছোঁয়া একেবারে বারণ। সত্যি, এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! টাকা নয়, মোহর নয়—মাত্র একটি আনি! আর তারই অভাবে পট্‌কা থেকে মাছ বেরুবে না, এই বা কেমন কথা?

দিদিমার কাছে খাবার জিনিস চাইলেই পাওয়া যাবে—কিন্তু পয়সা নয়। বাজার সরকার কুইনা মামার কাছে চাইলে তেড়ে মারতে আস্‌বে। মার কাছে কিম্বা মামীর কাছে চাইবার ত' সাহস নেই! সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার প্রশ্নের বান এসে আমায় কাবু করে ফেলবে!

কি করে পাওয়া যায় তবে সাত রাজার ধন এই মহামূল্য মণিটি?

হঠাৎ দুষ্টু বুদ্ধি জাগল মাথায়। বড় তরফে—বড় মামার বালিশের তলায় খুচরো পয়সা থাকে দেখেছি। সেইখান থেকে একটি আনি নিলে ক্ষতি কি? কেউ জান্‌তেও পারবে না।

সেই ঘরেরই দোতলায় কাঠের মেঝেয় আমাদের 'খেলাঘর' বসে মাঝে মাঝে। বর-বৌ আর আর ঘর-কন্নার খেলা হয় সেই দোতলায় গোপনে। মেঘিদি আমার বৌ সাজে—তাদের ওখানে হামেশা ত' যেতেই হয়।

মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, খেলতে গিয়ে একটি আনি বড় মামার বালিশের তলা থেকে নিয়ে আসতে হবে।

তার পরেই কে যেন কানে-কানে ফিস্ ফিস্ করে বললে, অ্যাঁ! চুরি করবি? আবার দুষ্ট বুদ্ধিও আর এক জন সঙ্গে সঙ্গে কথা জুগিয়ে দিলে, আরে বোকা! এতে আর দোষ কি? পরের বাড়ী থেকে ত' আর চুরি করছিস্ নে! এ ত নিজের মামা বাড়ী। না হয় আনিটা পরে রেখে গেলেই হবে! তাই বলে মাছের ছানা বেরুবে না পট্‌কা থেকে?

শেষ কালে দারুণ কৌতূহলেরই জয় হল। যখন দেখলাম ঘরে কেউ কোথায়ও নেই—টুক করে বালিশটা তুলে নিয়ে একটা আনি পকেটে পুরে পালিয়ে এলাম।

কিন্তু কোথায় মাছের ছানা—? একদিন যায়—দু' দিন যায়—তিন দিন যায়—শেষকালে দেখা গেল পট্‌কাটাই ফেটে গেছে! সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত প্ল্যানও মাটি!

আনিটা অবশ্য যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তাই বলে চুরির অপরাধটা ত' আর কাটেনি?

ছেলেবেলাকার আর একটি অপরাধ গোপন করার কথা মনে পড়ছে।

আমাদের পূবদ্বারী ঘরের দক্ষিণ দিকের ছোট্ট কুঠুরীতে একটি আল্‌না ছিল। খুব পল্‌কা আল্‌না—হালকা কাঠ দিয়ে একটু সৌখীন ভাবে

তৈরী। সেই আল্‌নায় থাকতো আমাদের জামাকাপড়, মামীর সাড়ী, ব্লাউজ সব সাজানো।

সেদিন কি একটা তাড়াহুড়োর কাজে জলদি করে জামা পরে বোধ করি খেলাধূলার ব্যাপারে ছুটতে হবে। আমার জামাটা ঝোলানো আল্‌নার সব চাইতে উঁচু ডাণ্ডার সঙ্গে। একবার হাত উঁচু করে যখন ওটাকে হাতানো গেল না—তখন খুব তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করবার জন্য আল্‌নার একটি ডাণ্ডার ওপর পা দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মটাং করে গেল সেটা ভেঙে!

কাজটা যে খুব গোলমেলে হল সে কথা বেশ বুঝতে পারলাম। কিন্তু তখন আর গালে হাত দিয়ে বসে ভাববার সময় নেই। এক্ষুণি খেলার দলে গিয়ে হাজির না হলে হয়ত যোগ দিতেই পারবো না। তাই তাড়াতাড়ি করলাম কি, একটা দড়ি দিয়ে ভাঙা ডাণ্ডাটা বেঁধে ফেললাম, তারপর কতগুলো জামা-কাপড় দিয়ে দুর্ঘটনার যায়গায়টা ঢেকে রেখে চুপি চুপি পালিয়ে এলাম খেলার মাঠে।

দিন দুয়েকের মধ্যে ব্যাপারটা আর ধরা পড়ল না।

হঠাৎ কে যে গোয়েন্দাগিরি করে এই সাঙ্ঘাতিক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে বসল সে কথা আজ মনে নেই। তবে কে ওই কাণ্ডটি করেছে তাই নিয়ে তোলপাড় সুরু হয়ে গেল গোটা বাড়ীতে। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আসল কথা জান্‌বার জন্যে আরো তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ডিটেক্‌টিভের প্রয়োজন।

লোকের পকেট কাটার কাজে নতুন যার শিক্ষানবিশী সুরু হয়েছে, গলির মোড়ে পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ীটা দেখলেই তার যেমন মুখখানি আপনা থেকেই শুকিয়ে ওঠে আর গলা কাঠ হয়ে জল-তেষ্টা পায়—আমার অবস্থা অনেকটা ঠিক সেই রকমই হল। পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করি সব সময়। মোট কথা আমি নিজেই আমার হাব-ভাব দিয়ে ধরা দিলাম যে—এ নাটের গুরু আমি ছাড়া আর কেউ নয়।

বেশ কিছু উত্তম-মধ্যম যে লাভ হয়েছিল সেটা মনে আছে। তবে

মনে মনে বিচার করে আগে থাক্‌তেই ধরে নিয়েছিলাম যে, এটা আমার প্রাপ্যই ছিল। যাই হোক—একটা সমস্যার একেবারে সমাধান হয়ে গেল—আর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে না। খেলতে গিয়েও বারে বারে ভাঙা আলনার দড়িটা গলার রজ্জু হয়ে উঠবে না!

পাওনা-গণ্ডা একেবারে চুকে গেল, এইবার একেবারে নিশ্চিন্দি।

এই ঘটনার সঙ্গে আর একটি ঘটনা মনের কোণে উঁকি মারে। সে দিন মনে করেছিলাম—শাস্তিটা আমার প্রাপ্য নয়—মিছিমিছি আমার ওপর সেটা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

যে বয়সের গল্প বল্‌ছি—তখন মামী ছিল আমার সব চাইতে বড় বন্ধু। গল্প শোনাতে মামী, খেলার সাথী মামী, পড়ার বইয়ে সুন্দর মলাট লাগিয়ে নাম লিখে দিতে মামী ছাড়া আর কারুর কাজ আমার পছন্দ হত না। কাজেই মামীর কথা ছিল আমার কাছে বেদবাক্য।

সেই মামী আমায় একদিন ডেকে বললেন, এই পোষ্টকার্ডটা নিয়ে যা—কাউকে দেখাবি নে—একেবারে সোজা পোষ্টাপিসে ফেলে দিবি।

এই জাতীয় মজাদার কাজে আমার চিরদিনের আনন্দ। শুধোলাম, ও! কলকাতায় দিদিমাকে লিখেছেন বুঝি?

মামী শুধু মুচকি হেসে মাথা নাড়লেন, কোনো জবাব দিলে না।

পোষ্টকার্ডের দিকে চেয়ে দেখলাম—ক্ষুদি ক্ষুদি অক্ষরে অনেক কিছু লেখা আছে। মনে করলাম খুব জরুরী চিঠি বুঝি—। এক ছুটে একেবারে পোষ্টাপিসে গিয়ে হাজির হবো—এই ছিল আমার মতলব।

ঠিক দৌড় দেবার মুখে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন মামা। বললেন, কোথায় যাচ্ছিস্ রে? পোষ্টাপিসে বুঝি? চিঠিখানা দেখি—

আমি পোষ্টকার্ডখানা মামার হাতে তুলে দেবো কি না একটু ইতঃস্তত করছি—মামী ইসারা করে হাসতে হাসতে জানালেন, না। ততক্ষণে মামা আমার হাত থেকে চিঠি নিয়ে পড়তে সুরু করে দিয়েছেন।

আমার মনে হল, মামী আমাকে যে কাজের ভার দিয়েছেন—আমি বুঝি তার অযোগ্য হয়ে গেলাম। হয়ত চিঠিতে এমন দরকারী কথা

লেখা আছে যা আর কেউ জান্‌লে মামীর ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে। ছেলেমানুষী বুদ্ধি আর কাকে বলে!

আমি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ছোঁ মেরে মামার হাত থেকে পোষ্টকার্ড-খানা কেড়ে নিলাম।

মামার কাছে কোনো দিন মার খাইনি—শুধু আদরই পেয়েছি। কিন্তু সে দিন হঠাৎ তিনি রেগে গিয়ে আমার কান পাকড়ে ধরে বললেন, এক ঠেঙে হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্।

তাঁর আদেশ অমান্য করবার শিক্ষা আমরা পাইনি। ঠিক সেই রকম ভাবে এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—কোনো প্রতিবাদ করলাম না, শুধু দারুণ অভিমানে চোখ দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

মামাকে মামী বললেন, তুমি ত আচ্ছা মানুষ! আমি ওকে বারণ করেছি আমার চিঠি কাউকে না দেখাতে। ও আমার কথা রেখেছে। ওকে মিছিমিছি শাস্তি দিলে চল্‌বে কেন?

আমি রেগে অনেকক্ষণ ওই ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মামীর অনুরোধেও পা নামাতে রাজি হইনি।

সে দিন কিশোর মনে এই প্রশ্নই জেগেছিল—কোন দোষ করিনি, তবু কেন শাস্তি পাবো?

পরে অবশ্য মামী আমায় আদর করে কাছে টেনে নিলেন। কিন্তু এই ঘটনার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে এবং বহু কাল ধরে এই সাজা আমার মনে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল।

ছেলেবেলায় আমরা দু' ভাই পালা করে ম্যালেরিয়ার ভুগতাম। জ্বর যখন আস্‌ত একেবারে হু-হু শব্দে কাঁপুনীর সপ্তম স্বর্গে পৌঁছে দিত। কাঁথার ওপর কাঁথা চাপিয়ে দেয়া হত শরীরের ওপর। কিন্তু তাতেও শীত মানে না। হিমালয়ের শিখরে কিম্বা এস্কিমোদের দেশে চলে গেছি কি না কে জানে? তারপর চাপানো হত লেপ আর কম্বল। সারাটা দেহ তবু ভূমিকম্পের মতো কাঁপতে থাক্‌ত।

ছেলেবেলায় গল্প শুন্‌তাম, 'ভালুকে জ্বর' না কি ঠিক এই রকম। হু-হু শব্দে আসে, জ্বরে কোঁ-কোঁ করে কাঁপতে থাকে ভালুক, আবার কখন যে সেই দারুণ জ্বর পালিয়ে যায় ভালুক তার হদিশ পায় না!

আমাদেরও অনেকটা সেই অবস্থা! দিব্যি ভালো আছি, রদ্দুরে রদ্দুরে ঘুরে ফল-পাকড় খাচ্ছি, খেলাধুলা করে বেড়াচ্ছি নিজের ইচ্ছে মত, আর দিদিমার ভাণ্ডার থেকে পিঠে-পায়েস খাওয়াও বাদ যাচ্ছে না—হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হল—ভালুকে-জ্বর—আর সব-কিছু একেবারে এক দিনে বন্ধ।

এই রকম ভালুকে-জ্বর মাসের মধ্যে বেশ কয়েক পালা হয়ে যেতো। শীতটা যখন হু-হু করে সারা দেহ কাঁপিয়ে আস্‌ত তখন বেশ ভালই লাগত। কিন্তু তার পরেই জ্বর যখন নাম্‌তে থাক্‌ত—শরীরটা যে কী খারাপ হত—তা বলবার নয়। মুখ হত বিস্বাদ। সারা দেহকে কে যেন হামান-দিস্তে দিয়ে ভেঙে-চুরে-গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। প্রথম দিকে থাক্‌ত যেমন প্রচুর জলকেষ্টা—শেষ কালে জল আর মুখে দেয়া যেত না। আর সমস্ত দেহে-মেনে যেন কী খাই কী খাই ভাব!

একেবারে যেন বক রাক্ষসের ক্ষিদে।

যা পাবো—হু'হাতে সব মুখে পুরে দেবো এমনি অবস্থা। যেদিন অন্নপথ্য করবো—তার আগের দিন রাত্তিরে ঘুম আর কিছুতেই আসে না। কখন ভোর হবে, কখন মার হাতের রান্না মাছের ঝোল ভাত খাবো, শুধু সেই চিন্তা।

রাত হবে তখন তিনটে। বাড়ী শুদ্ধু লোক ঘুমুচ্ছে। আমিও ঘুমুচ্ছি মার পাশে শুয়ে। হঠাৎ কা-কা শব্দ শুনে মনে হল ভোর হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলাম, ভোর হয়ে গেল যে, আর কত ঘুমুবে? ওঠো না! আমি যে আজ ভাত খাবো!

আমার আচম্‌কা ধাক্কা খেয়ে মা ধড়মড় করে উঠে বসল। তারপর একবার দরজা খুলে বাইরে ঘুরে এসে বললে, দূর বোকা! এখন যে শেষ রাত্তির রে! জ্যোৎস্না দেখে কাক অমন ডাকে।

লজ্জা পেয়ে পাশ ফিরে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সকাল থেকে আমার তাগিদে বাড়ী শুদ্ধু লোক অস্থির। খুব পুরোনো চালের নরম ভাত না হলে কিন্তু আমি খাবো না। দিদিমা আর মা যে আগে থেকেই পুরোনো সরু চালের ব্যবস্থা করে রেখেছে তা ত আমি জানি না!

তাই ওরা আমার কথার কোন উত্তর দেয় না—শুধু মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে থাকে।

জ্বরের পর প্রথম যেদিন ভাত খাবো সেদিন মার দুর্গতি আর ছুটোছুটির অন্ত থাকে না।

আমার রান্না করে, আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে ঠাণ্ডা করে—ডুব দিয়ে গিয়ে আবার হবিষ্য ঘরে ঢুকতে হবে।

বছরের সব দিন ঠাকুরের রান্না চলবে কিন্তু জ্বরের পর যে প্রথম অন্নপথ্য করা সেটি মার হাতের রান্না না হলে চলবে না।

এই দিন মাকে বাড়তি খাটুনি সহ্য করতেই হবে।

রান্নাঘরের বারান্দায় চলেছে মার রান্না, আর আমি পূবদ্বারী ঘরের উত্তর দিকের দরজার চৌকাঠে বসে প্রহর গুণছি।

খানিকক্ষণ হয়ত চুপচাপ বসে রইলাম, তারপর প্রশ্ন করলাম,

—আচ্ছা মা পটল সেদ্ধ দিয়েছ ত?

হ্যাঁ রে হ্যাঁ!

—শিং মাছের ঝোল কিন্তু আজ কোরো না—

—তবে?

—ধনে পাতুরী করো, বেশ লাগবে খেতে।

—আচ্ছা, আচ্ছা—

এই রকম কাটা কাটা কথা চলে খানিকক্ষণ।

—মাছ পাওয়া গেছে ত?

—পাগাড়ে যখন গেছে—তখন কি আর মাছ না নিয়ে ফিরবে? পাগাড়ের কথা মনে পড়ে।

সবাই ওকে ডাকে—'পাগাইড়্যা' বলে।

খাল-বিল-নদী-নালা-পগাড়ে কেবলি মাছ মেরে বেড়ায় বলেই ওর পাগাড়ে নাম হয়েছে কি না বলা শক্ত।

তবে মামী বেশ মজার কথা বলেন। ওর না কি মৎস্য রাশি। মাছ সংগ্রহ করতে গিয়ে পাগাড়ে কখনো বিফল মনোরথ হয়নি। ও যেখানে বঁড়শী ফেলে বস্‌বে—মাছেদের নাকি সেখানে না এসে উপায় নেই! মাছেরা পাগাড়ের হাতে মরতে এত ভালোবাসে—সত্যি ভারী মজার ব্যাপার!

সারা গ্রাম টই-টম্বুর জলে ভর্ত্তি—মাছেদের টিকিটি দেখবার যো নেই—কেউ মাছ সংগ্রহ করতে পারছে না—পাগাড়েকে খবর দাও, ও ঠিক জুটিয়ে আন্‌বে' খন।

মামী নাক কুঁচকে বলেন, নিরিমিষ আমি খেতে পারি নে। একটু আঁস্‌টে গন্ধ না হলে কি ভাত খাওয়া যায়? পাগাড়ে যাক, ও ঠিক জোগাড় করে নিয়ে আস্‌বে।

এতটুকু বাড়িয়ে বলেননি তিনি। পাগাড়ে ঠিক হাস্‌তে হাস্‌তে একটি মাছ নিয়ে এসে হাজির হল। বেঁটে খাটো কালো-কোলো মানুষটি। ছোট ছোট চুল। কিন্তু মুখে হাসি লেগেই আছে।

আর এক জন ছিল, তার তার যোলই।

মৎস্য-মেধ যজ্ঞ করতে সেও কম যায় না।

যে বাড়ীতে যোলই কাজ করে সে বাড়ীর গেরস্তরা নিজেদের ভাগ্য-বান বলে মনে করে। এমনি ঘরের কাজ ত' হবেই, তা ছাড়া যখন-তখন জুটবে মাছ।

সেই জন্যে গেরস্ত বাড়ীতে যোলইকে নিয়ে লোফালুফি চলে।

জ্বরের পর অন্নপথ্য করার গল্প থেকে একেবারে রসনা-তৃপ্তিকর মৎস্য-কাহিনীতে এসে পড়েছি।

আমি যে সময়ের কথা বল্‌ছি—তখন আমাদের গাঁয়ে এই ছড়াটাই সব সময় আনাগোণা করতো অনেক ছেলের মনে—

"লিখিব, পড়িব মরিব দুখে—
মৎস্য মারিব, খাইব সুখে।"

আজ আমার ছেলেবেলাকার আর এক বন্ধু ঘুপুর কথা জাগছে মনে। ঘুপু একটা ছোট বঁড়শী নিয়ে—নানা পুকুর আর ডোবার ধারে ঘাপ্‌টি মেরে চুপচাপ বসে থাক্‌ত। বড় বড় কৈ মাছ গেঁথে তুল্‌তে ঘুপুর হাত ছিল একেবারে সব্যসাচীর মতো। ওর শীকার-কাহিনী ছিল সর্ব্বজনবিদিত। বড় হয়ে ঘুপু একজন নামকরা লাঠি খেলোয়াড় হয়েছিল। শরীরচর্চ্চা করে নিজের স্বাস্থ্যের একেবারে নতুন রূপ দিয়েছিল। কিন্তু ছেলেবয়েসের ঘুপুকে দেখে সে কথা বোঝবার যো ছিল না।

শুভার্থী আর কল্যাণকামীরা ওর কাণ্ডকারখানা দেখে বল্‌ত,— ওরে ছোঁড়া, তুই যে রকম আদাড়ে-বাদাড়ে আর জলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াস্‌—কোন্‌ দিন শুন্‌বো সাপে তোকে কেটে রেখেছে!

ঘুপু কোনো প্রতিবাদ করত না—শুধু খিল্‌ খিল্‌ করে হাস্‌তো! সেই লিক্‌লিকে কালো ভয়লেশহীন ছেলেটা যে বড় হয়ে আবার লাঠি ও তলোয়ারের খেলায় সারা বাংলায় নাম করবে সে কথা সে দিন কে ভেবে রেখেছিল? স্বদেশী করে দীর্ঘকাল কারাবরণও করেছিল সে। অকালমৃত্যু ঘুপুর কর্ম্মমুখর জীবনে ইতি টেনে দিয়েছে।

ছেলেবেলায় প্রথম যে উপহার পেয়েছিলাম—সে কথা আমার মনের অদেখা খাতায় আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

মামাবাড়ীতে খুব আতুরে ছিলাম বলে বেশী বয়সে আমার লেখাপড়া সুরু হয়।

একবার মামা কলকাতা থেকে দেশে এসে মত প্রকাশ করলেন যে, আর আমার আল্‌গা-আল্‌গা ভাবে আদর কাড়লে চল্‌বে না। এইবার থেকে লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

তিনি নিজেই গিয়ে গ্রামের মাইনর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দিলেন। ইস্কুলটির নাম সাকরাইল গ্র্যাণ্ট-ইন্‌-এইড্‌ এম-ই স্কুল। তীর্থবাসী পণ্ডিত হচ্ছেন এই বিদ্যালয়ের প্রাণ। অন্যান্য সব শিক্ষকদের ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে-থুয়ে যে ক'টা টাকা অবশিষ্ট

থাকে তাই হাসিমুখে গ্রহণ করেন ; কিন্তু খাতায় সই করতে হয় বেশী অঙ্কের পরিমাণ। আমারই এক আত্মীয়-বাড়ী থাকা-খাওয়ার বদলে ছেলে-মেয়েদের পড়ান। তিনি ভিন দেশের মানুষ, কিন্তু ইস্কুলটা যেন তাঁর জীবন। শুনতে পাই আমাদের গাঁয়ের তিন পুরুষ তাঁর কাছে লেখাপড়া করেছে। তাই গ্রামে তীর্থবাসী পণ্ডিতের সম্মান সব চাইতে বেশী।

এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার আগে আমি রজনী পণ্ডিত মশায়ের কাছে কিছুদিন পড়েছিলাম এবং আমার অক্ষর-পরিচয় হয় সর্ব্বপ্রথম তাঁর কাছেই।

কিন্তু তীর্থবাসী পণ্ডিতের খ্যাতি আর সম্মান ছিল সর্ব্বজন-বিদিত। গ্রামের যে কোনো বাড়ীতে উৎসব কিম্বা নেমন্তন্ন থাকুক—তীর্থবাসী পণ্ডিত সেখানে আমন্ত্রিত হবেনই। সারাটা গ্রামের লোক তাঁকে একেবারে আলাদা চোখে দেখতো।

বড় হয়ে আমরা তাঁর ছাত্রের দল যখন "তীর্থবাসী-জয়ন্তী" উৎসব করেছিলাম এবং তাঁর হাতে ১০১৲ টাকা তুলে দিয়েছিলাম নিজেরা চাঁদা করে, সেদিন তাঁর মুখে যে তৃপ্তি ও সাফল্যের হাসি দেখেছি তা কোনো দিনের তরেও ভুল্‌তে পারবো না।

কত বার দেখেছি, পণ্ডিত মশায়ের ছেলে এসে সাধাসাধি করে গেছে দেশে ফিরে যাবার জন্যে— ; বুড়ো বয়সে তিনি নিজে হাতে রান্না করে দিনের পর দিন ভাতে-ভাত খেয়েছেন আর কচ্ছপের কামড় দিয়ে মুমূর্ষু বিদ্যালয়কে কোনো রকমে জিইয়ে রেখেছেন— সেই সব কাহিনী কোনো ইতিহাসের পাতায় লেখা থাক্‌বে না। তীর্থবাসী পণ্ডিতের সেই আজীবন-তপস্যা আর সাধনা আজ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

যাক্, আমার ভর্ত্তি হবার যে কাহিনী বলছিলাম। আমি যখন ভর্ত্তি হলাম—তখন এই বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার হচ্ছেন গাঙ্গুলী মশাই। তাঁর পরিচয় আগেই দিয়েছি।

মামা ভর্ত্তি করে দিয়েই আবার সঙ্গে করে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে

এলেন। বললেন, আজ রাত্তিরেই বই কিনে দেবেন। টাঙ্গাইল শহর আমাদের গ্রাম থেকে মাত্র দেড় মাইল দূর। কাজে-অকাজে হামেশা সেখানে লোক যাতায়াত করে। সেই টাঙ্গাইল থেকে বই নিয়ে আস্‌বে কুইনা মামা।

সারাটা বিকেল ছট্‌ফট্‌ করে কাটল। কখন নতুন বই আস্‌বে, কখন সে বইয়ের ছবি দেখবো, মামী তাতে মলাট লাগিয়ে নাম লিখে দেবেন। কেবলি ঘর-বার করতে লাগলাম।

সেই বিকেল বেলাটা আর খেলাধূলায় মন বস্‌ল না। বাড়ীর সবাইকে জিজ্ঞেস করে ব্যতিব্যস্ত করে তুললাম—কখন কুইনা মামা সওদা করে ফিরে আস্‌বে!

ক্রমে সন্ধ্যে উৎরে গেল—তবু কুইনা মামার দেখা নেই। তাই ত! ভারী রাগ হল কুইনা মামার ওপর। আজ কি যত রাজ্যের জিনিস্‌ কিনে আন্‌ছে না কি? কেন, শুধু বইটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা যায় না?

আরো রাত বাড়লো—কিন্তু কোথায় কুইনা মামা?

আমার চোখ ঘুমে ঢুলে এলো—তবু মুখে প্রশ্ন, আমার বই কি এখনো এলো না?

মামী বললেন, তুই যদি ঘুমিয়ে পড়িস ত' তোর শিয়রে বই রেখে দেবো'খন। সকাল বেলায় চোখ মেলেই দেখতে পাবি—নতুন ঝক্‌ঝকে বই। এখন খেয়ে নে!

কিন্তু বই হাতে না পেয়ে খেতে আমি রাজি নই। সে রাত্তিরে কিচ্ছটি খেলাম না। ঘুমে চোখের পাতা বুঁজে এলো। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিশি যে কখন তাতে এসে ভর করেছে জানতেও পারিনি।

রাত্তিরেও বইয়ের স্বপ্ন দেখেছিলাম কি না ঠিক মনে নেই। কিন্তু খুব সকালে গেল ঘুম ভেঙে।

শিয়রে তাকিয়ে দেখি সত্যি ত!

ইস্কুলে যে বই পড়তে হবে—তাই রয়েছে ঠিক বালিশের পাশে! কুইনা মামা তাহলে অনেক রাত্তিরে ফিরেছিল আর মামীও তাঁর কথা

ভোলেননি। ঠিক আমার শিয়রে রেখে দিয়েছেন বইটি। কিন্তু তখনে আমার কাছে আসল বিষয় লুকোনো ছিল। সেই "নীতি-সুধা" বইটা টেনে নিতেই তার তলা থেকে উঁকি দিলে আর একখানি বই!

অবাক কাণ্ড!

এ বইয়ের কথা ত' মামা আগে বলেননি!

ওপরে চমৎকার ছবি—লেখা রয়েছে "হাসিখুসী"। আলিবাবার চোখের সামনে যে দিন চিচিং ফাঁক্ হয়ে গিয়েছিল—আর রাশি রাশি মণি-মুক্তো, হীরে-জহরৎ বেরিয়ে পড়েছিল সেদিন সেও বোধ হয় এতটা আশ্চর্য্য হয়নি যতটা আমি হয়েছিলাম সেদিন সকাল বেলা—পাঠ্যপুস্তকের তলায় এই "হাসিখুসী" আবিষ্কার করে।

এমন মজার বই আছে পৃথিবীতে?

সারাদিন ধরে নতুন বইয়ের মজার গন্ধ শুঁক্‌তে লাগলাম, পাতার পর পাতা উল্টে ছবি দেখতে লাগলাম আর নাওয়া-খাওয়া ভুলে ক্রমাগত ছড়া আওড়াতে লাগলাম—

"অজগর আস্‌ছে তেড়ে
আমটি আমি খাব পেড়ে"

সত্যিকারের আমের চাইতে ছবির আম আর ছড়া যে এত মিষ্টি হয় সে কথা কি এর আগে জানা ছিল?

এই হল আমার জীবনে প্রথম ও সেরা উপহার।

আমার বড়মামার ছেলে ছোক্কন—একেবারে আমার সমবয়েসী। ওর কথা আগেই বলেছি। হয়ত আমার চ'ইতে দু'-এক মাসের ছোটই হবে।

সেই ছোক্কন কিন্‌লে এক ছাতা। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে ছাতা কেনা হল বটে—কিন্তু এই ছত্র-লাভ হওয়ায় তার বিপদ বাড়ল বৈ কমল না।

ছাতাটা খুলে মেঝের ওপর রেখে দেবে ছোক্কন—কিন্তু ছাতার যে

কয়টা শিক মাটি ছুঁয়ে থাক্‌বে তাদের কি করে বাঁচানো যায়—এই হল তার এক মহা সমস্যা।

অতি সাবধানী ছোক্কন ভেবে ভেবে আকুল। কিছুতেই কিছু ঠিক করতে পারে না। তবে কি অমন নতুন ছাতার শিকগুলি মৃত্তিকাস্পর্শে অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে?

ধ্যানীর সাধনা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সে স্থির করলে, যে শিকগুলি মাটি ছুঁয়ে আছে তাদের তলায় এক টুক্‌রো করে কাগজ দিয়ে রাখতে হবে এবং এই ভাবেই ছাতা অকালে বিলোপের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

আমাদের সরকার বাহাদুর ভারতের প্রাচীন মন্দির আর মূর্ত্তিগুলি রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছোক্কনের নতুন ছত্র রক্ষার জন্যে এ রকম কোনো কিছুরই ব্যবস্থা ছিল না।

সেটা কি ছেলেবেলায় তার কম দুঃখের কারণ হয়েছিল?

ছোক্কনের একটি গোপন তহবিল ছিল। পূজো-পার্ব্বণে তখন ছেলেদের হাতে পরবী দেয়া হত। কখনো দু'-আনা, কখনো বা একটি সিকি। আমার এই সব পার্বণী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেহিসাবীর মতো খরচ করে ফেলতাম। সেকালে এক রকম তক্তা-বিস্কুট পাওয়া যেত—তার ওপর চিনি ছড়ানো থাক্‌ত। ছোটদের কাছে এইটিই ছিল রাজসিক ভোজ। এ ছাড়া চানাচুরওয়ালার সঙ্গেও সব ছেলের মিতালী ছিল। ছোক্কন কিন্তু তার পরবীর একটি পয়সাও বিরাট সাম্রাজ্যের বিনিময়ে দিতে রাজি ছিল না! কাজেই তার পয়সা-কড়ি দিব্যি ছানা-পোনা নিয়ে গোকুলে বাড়তে থাকত।

এই গোপন ধন-ভাণ্ডার সে বিশেষ কৌশলের সঙ্গে রক্ষা করত। কোনো তোষকের তলায়, ঘাটের কোনো ভাঙা সিঁড়ির ফোঁকরে, কিম্বা কোনো গাছের কোটরে সে সযত্নে তার থলিকে লুকিয়ে রাখত। শুধু তাই নয়—সে বারে বারে গিয়ে যখন-তখন খুলে দেখত ভাণ্ডার ঠিক আছে কি না। তার পর একদিন যখন থলিটি কোনো কৌশলী

যার যে রকম ইচ্ছে মত দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কুমোর ভায়া নিজের মনোমত মূর্ত্তি তৈরী করে বসে আছে।

অবশ্য সে মূর্ত্তি খুব ভালই হয়েছে।

তখন সবাই ঘাড় কাৎ করে বল্‌তে সুরু করলে, সুন্দর হয়েছে, খাসা হয়েছে। এমন প্রতিমা না হলে কি অঞ্জলি দিতে মন ওঠে?

ইস্কুলের সামনে গেট তৈরী করতে হবে। ছেলেদের মধ্যে বয়েসে যারা একটু বড়ো—তারা গ্রামের বিভিন্ন বাঁশ-ঝোপ থেকে বেমালুম বাঁশ কেটে নিয়ে আসে। প্রত্যেক বাড়ীর কর্ত্তাই ইস্কুলের সঙ্গে জড়িত, আর প্রায় সব বাড়ীর ছেলেই এই স্কুলে পড়তে আসে। কাজেই বাঁশ কাটার অনুমতির প্রশ্ন বড় একটা ওঠে না।

ছেলেদের হাতের মুন্সীয়ানা আছে বল্‌তে হবে। ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্ররা হাতের দা দিয়ে বাঁশকে চিরে নিয়ে দেখতে দেখতে সুন্দর গেট তৈরী করে ফেলে। তার ওপর লাগানো হয়—পাতাবাহার গাছের ডাল, আর সাজানো হয় লাল-নীল কাগজ দিয়ে। তখনকার দিনে 'স্বাগতম' লেখার রেওয়াজ হয়নি। গেটের ওপর নীল কাগজের জমিনে—লাল কাগজ কেটে লেখা হত—Wel Come!

সরস্বতী পূজোর আগের দিন শেষ রাত্তিরে উঠে গাঁয়ের নানা বাগান ঘুরে ফুল চুরি করে নি—এমন ছেলে-মেয়ে সে সময় খুঁজে পাওয়া মুস্কিল ছিল।

সরস্বতী পূজোর আগে যেমন কূল খাওয়াটা নিষেধ ছিল—ঠিক সেইরকম ফুল চুরি করে বীণাপাণির চরণে অঞ্জলি দিতে হবে এটা যেন রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল।

তখনকার দিনে ঘরে ঘরে ত' আর অ্যালার্ম দেয়া ঘড়ি থাকত না। তাই আকাশের তারার গতিবিধি দেখে ছেলের দল চুপি চুপি ঘুম থেকে উঠত। প্রত্তেকের হাতে থাকত একটি করে ফুলের সাজি। কেউ কেউ আবার বেতের ধামা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। তারা থলকমল, পলাশ আরো রকমারী ফুল তুলে ধামা ভর্ত্তি করে ফেল্‌ত।

সক্কলকার আগে যার ঘুম ভাঙত সে গিয়ে পাড়ার আর একজনকে

ডেকে তুলত। তারা দুজনে গিয়ে আবার আর একজনকে। এই ভাবে বাহিনী দীর্ঘ হতে থাকত।

তখন এক জায়গায় সবাই বসে পরামর্শ করে ঠিক করা হত কে কোন্ বাগানে যাবে।

—তুই যা সেনের বাড়ীর বাগানে—

—ঠাকুর বাড়ীর বাগানে নানারকম ফুল ফোটে, টোনা ঠাকুর তোর ওপর ভার রইল সব কোঁচড় ভর্ত্তি করে নিয়ে আস্‌তে হবে!

—মুন্সী বাড়ী, নয়া বাড়ী আর পুরাণ বাড়ীর ভার রইল ফটিক আর নির্ম্মলের ওপর।

—এদিকে পশ্চিম পাড়ার বাগানগুলো ঝেঁটিয়ে নিয়ে আসবে নরা সেন আর রামা। দুজনেই ওস্তাদ।

—সুরেশ, যোগেশ, মুইচ্যা কায়স্থপাড়ার দায়িত্ব কিন্তু তোদের নিতে হবে।

আবার যে যে বাড়ীতে কুকুর আছে—সেখানে সবাই সাবধান! অনেক বুদ্ধিমান ছেলে সঙ্গে করে মুড়ি-মুড়কি ইত্যাদি নিয়ে যেতো। ঐগুলি দিয়ে কুকুরের মুখ বন্ধ করতে হবে।

সূয্যি মামা পূব আকাশে উঁকি দেবার আগেই যে রাশি রাশি ফুল এসে জড় হত—তা দেখে অতি নিষ্ঠাবান পূজারী ঠাকুরও লোভী হতে উঠত!

হনুমানের গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে আসার সঙ্গেই ছেলেদের কাজের তুলনা চলে! সক্কলকার মুখে তখন আর হাসি ধরে না!

ইস্কুলের পূজো ছাড়াও আর কয়েকটি বাড়ীতে সরস্বতী পূজো হত। কিন্তু আমাদের বাড়ীর পুজোয় অঞ্জলি দিতে মন উঠ্‌ত না! না খেয়ে থেকে যদি ইস্কুলের প্রতিমার কাছেই অঞ্জলি না দেয়া হল—তবে বিদ্যে হবে কিসে?

ইস্কুলের পূজোও হত অনেক দেরীতে। তবু পাছে বিদ্যে না হয় এই ভয়ে আমরা জনাকয়েক না খেয়ে থাক্‌তাম শেষ পর্য্যন্ত।

আমার ভাগনে মুকুল সব ব্যাপারে ছিল বেপরোয়া। সে বলত,

আগে গরম গরম লুচি, বেগুন ভাজা, আর ক্ষীর ত' খেয়েনি, তারপর ভরা পেটে অঞ্জলি দিলে ভালো করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারবো !

সে সকাল বেলা থেকেই মুখ চালাতে সুরু করত ! আমরা শিউরে উঠে বলতাম, কি করছিস হতভাগা, বিদ্যে হবে না যে !

সে নির্ব্বিবাদে লুচি মুখে পুরত আর হাসতে থাকৃত ! ওর এই নির্ভীক কাণ্ড কারখানা দেখে আমরা সত্যি ভড়কে যেতাম ! সত্যি কি দুর্জ্জয় সাহস ছেলেটার ! এতটুকু ভয়-ডর নেই !

বিকেলে চারটের সময় স্কুলবাড়ীতে পূজো শেষ হতে আমরা অঞ্জলি দিতাম—ক্ষিদেয়, তেষ্টায় তখন দলশুদ্ধু সবাই ধুঁকৃছি। তবু মনে মনে এই ভরসা ছিল মা বীণাপাণির আশীর্ব্বাদে পরীক্ষার চৌকাঠগুলিতে আমরা আর হোঁচট খেয়ে পড়ব না —!

সরস্বতী পূজোর দিন বিকেলে আমাদের সব চাইতে বেশী খাটুনি ছিল—পরিবেশনে। ইস্কুলে যেসব ব্রাহ্মণ ছাত্র ছিল তারাই দল বেঁধে রান্না করত। পূজোর পর বিরাট পংক্তি-ভোজ বসে যেত। আমাদের ছুটোছুটি করে পরিবেশন করতে হতো।

—খিচুড়িটা আর এক হাতা করে দিয়ে যাও !

—আমার পাতে বেগুন ভাজা পড়েনি।

—এইদিকে আর একটু শাক দাও না ভাই—

—ছোলার ডাল আর একবার ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

—উঃ ! কি ঝাল হয়েছে চাট্‌নী। পায়েস আনো শীগ্‌গীর।

এই জাতীয় চীৎকার উঠত চারদিক থেকে—তারই ভেতর ছুটো-ছুটি করে পরিবেশন করা চাই। এক একটি ছেলে চট্‌পট পরিবেশন করতে পারত। বেশী বেশী করে পাতে ফেলে দিলেই ত' হল না। পাতে ফেলা যাবে না—অথচ সবাই খুশী হবে—ছোটরা পেট ফুলিয়ে বল্‌বে খুব খেয়েছি···তবেই পরিবেশনের বাহাদুরী।

ভোজের পালা সাঙ্গ হলে যার-যার এঁটো পাতা তুলে নিয়ে ইস্কুল বাড়ীর পেছনের ডোবার ধারে ফেলে দিতে হবে।

তারপর আর একটি কাজ বাকি থাকৃতো—সেটি হচ্ছে বড় বড়

কড়াই ডেক্‌চি, প্রভৃতি যাতে প্রসাদ রান্না হয়েছে—সব ধরাধরি করে কাছেই নীরোদদের বাড়ী রেখে দিয়ে আস্‌তে হত। কারণ ইস্কুল বাড়ী ত' বাঁশের বেড়ায় তৈরী। ওখানে এত গুলি দামী বাসন-পত্র রাখলে সব চুরি হয়ে যাবে।

যখন সব নিশুতি হয়ে গেছে—চারদিকে ঝি ঝি পোকা ডাকছে—তখন আমরা পণ্ডিত মশায়ের কাছ থেকে বিদায় দিয়ে বাড়ী ফিরে আস্‌তাম।

এই সরস্বতী পূজোর স্মৃতি বহুদিন ধরে ছোটদের মনে আনাগোনা করতে থাক্‌ত। গ্রামের পাঠশালায় এর চাইতে বড় উৎসব আর কি হতে পারে?

ফাল্গুন মাসের পার্ব্বণ হচ্ছে দোল। এই উৎসব সারা গ্রামকে একেবারে হোলিতে লাল করে দিত।

আমাদের গ্রামে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কোনো বাড়ীর বিগ্রহের নাম গোপীনাথ, কোনো বাড়ীতে তিনি নাম নিয়েছেন জনার্দ্দন, আবার আর এক গৃহে তিনি রাধাবল্লভ হয়ে বসে আছেন।

সারা গাঁয়ের বিভিন্ন গৃহে প্রতিষ্ঠিত এই শালগ্রাম শিলাকে কেন্দ্র করে স্বুরু হত দোলযাত্রা!

দোলের কয়েকদিন আগে থেকেই পট্‌কার শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যেত। গ্রামের আশে-পাশেই কয়েক ঘর কারিগর ছিল—তাদের কাজই হচ্ছে নানা রকম বাজী আর পটকা তৈরী করা। বড় বড় পট্‌কাও যে তারা তৈরী না করত তা নয়। সেগুলির শব্দে কানে তালা লাগ্‌বার জোগাড় হত।

উৎসব আস্‌বার অনেক আগে থেকেই আমরা পয়সা জমাতে স্বুরু করতাম। নইলে পট্‌কা কিন্‌বো কি দিয়ে? আবির আস্‌বে কোত্থেকে? অবশ্য দোলের সময় "পরবী" বলে আমরা চার আনা করে পেতাম। তখনকার দিনে তার দাম অনেকখানি।

ছোটদের কাছে দোলের প্রথম এবং প্রধান আকর্ষণ ছিল কুঁড়ে পোড়া।

এই কুঁড়ে পোড়ানোর প্রথা বাঙলা দেশের সব অঞ্চলেই প্রচলিত আছে কিনা আমার জানা নেই।

আমাদের গ্রামে যে ব্যাপারটা ঘট্‌ত সেই কথাই এই ফাঁকে বলে নি। দোলের আগের দিন সন্ধ্যেবেলা গ্রামের ঠিক মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে সার সার কয়েকটি খড়ের ঘর তৈরী হত!

এই কুঁড়ে ঘরগুলি সাধারণতঃ নয়াবাড়ীর বিলের ধারেই তৈরী করা হত।

গ্রামের যত বিগ্রহ আছেন তাঁদের শোভাযাত্রা করে এইখানে নিয়ে আসা হত। প্রত্যেকটি কুঁড়ের মধ্যে তাঁদের স্থাপনা করে পূজো দেয় হত। তারপর পুরোহিত ঠাকুরবিগ্রহদের সঙ্গে নিয়ে কুঁড়েগুলি প্রদক্ষিণ করতেন। প্রদক্ষিণ অন্তে সেই কুঁড়েগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হত।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত—পাশা-পাশি সেই কুঁড়েঘরগুলি। চারদিক আলোয়—আলোময় হয়ে যেত। শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-ঢোল—এসব একসঙ্গে বাজতে থাকৃত।

একটা লেলিহান শিখা উর্দ্ধাকাশে উঠে যেত। এই দৃশ্য দেখে ছেলের দল উল্লাসে করতালি দিত আর নৃত্য করতে থাকৃত! পট্‌কার আওয়াজে চারদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠত। ছেলেবেলায় মনে হত যেন একটা বিরাট যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। একদিকে কুঁড়ে ঘরের আগুন আর একদিকে পট্‌কার শব্দ—ছুয়ে মিলে শিশু-মনে আলোড়নের সৃষ্টি করত!

আসল আবির খেলা তার পরের দিন।

সারাটা গ্রাম একেবারে লালে-লাল হয়ে উঠ্‌ত।

পুব পাড়া আর পশ্চিম পাড়ার ছেলেরা অনেক সময় দুই দলে ভাগ হয়ে যেতো। তারপর চল্‌ত সারাদিন ধরে আবির যুদ্ধ।

ও পাড়ার ছেলে এ পাড়ার ছেলেকে আবির দিয়ে কাবু করেছে?

অম্নি দল বেঁধে ছোটা হল—সেই পাড়ার ছেলেদের শায়েস্তা করতে। প্রথমে আবির দিয়ে মুখ রাঙিয়ে দেয়া, তারপর চলত পিচ্‌কিরি। এখানকার মতো টিনের বা পেতলের পিচ্‌কিরি আমাদের আদৌ জুটতো না। আমরা পেতাম বাঁশের পিচ্‌কিরি। কিন্তু ছেলেবেলায় সেই রঙ্‌ খেলায় যে আনন্দ পেয়েছি তার মাধুর্য্য মন থেকে এতটুকু মুছে যায়নি!

'মেটে হোলি' বলে আর একটা নাম প্রচলিত ছিল। এ খেলাটা অবশ্য তখনকার দিনে সমাজের নীচু স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রচুর কাদা আর গোবর গুলে তাই মাথায় ঢেলে যে উৎকট হোলি-খেলা চল্‌ত—তারই নাম ছিল "মেটে হোলি।" এই মেটে হোলি উৎসবের একজন রাজা সাজানো হত। বিরাট ভুরি আছে এমন কোনো লোককে এই মজাদার কাজে বাছাই করে নেয়া হত। তারপর অদ্ভুত সব জিনিস দিয়ে তাকে রাজা সাজানো হত। যেমন জুতোর মালা গেঁথে তার গলায় পরিয়ে দেয়া হত। ধূচ্‌নি মাথায় শোভা পেতো রাজমুকট হিসেবে। মাছ ধরবার জাল দিয়ে হয়ত সেই রাজার উত্তরীয় তৈরী হত। এমন সব বিশ্রী আর দুর্গন্ধি বস্তু এই রাজার গায়ে মাখিয়ে দেয়া হত যে,—তার ত্রি-সীমানায় যায় কার সাধ্যি!

এই মেটে-হোলির রাজার সম্মান বড় কম ছিল না। অনেক সময় তাকে কাঁধে নিয়ে বিরাট মিছিল এগিয়ে যেতো! যখন যে পাড়ায় ঢুক্‌তো এই মিছিল,—সেখানে একেবারে হুল্লোড় সুরু হত। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মেটে-হোলির রাজাকে দেখবার জন্যে এসে ভীড় জমাতো।

কোন বছর কে 'মেটে-হোলি'র রাজা হবে—তাই নিয়ে গ্রামের নীচু সমাজে দারুণ প্রতিযোগিতা চলত!

আমাদের গ্রামের 'দোল-ভিটি' এখনো যেন চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে। গ্রামের এক প্রান্তে পুব পাড়ায় এই দোল-ভিটি।

সারাটা বছর ঘন ঘাসে আর জঙ্গলে ভর্ত্তি হয়ে থাক্‌তো। কেউ সে দিকে তাকিয়েও দেখ্‌ত না। অনেক সময় দেখা যেত কচি লক্-

লকে ঘাসের জন্যে বহু গেরস্ত বাড়ী থেকে এখানে গাই বেঁধে দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু দোলের কিছুদিন আগে থেকেই সারা গাঁয়ের দৃষ্টি গিয়ে পড়ত এই দোল-ভিটির ওপর। উৎসাহী লোকের অভাব কোন কালেই ছিল না। সময় মত ঠিকই যোগাযোগ হয়ে যেতো।

ছেলে-বুড়ো সবাই দেখ্‌তো—সেই ঘন জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে। যেখানে সাপ-কোপের ভয়—সেই অঞ্চলে ঘন-ঘন কুড়োল আর কোদাল পড়ছে। দোল-ভিটি আবর্জ্জনা মুক্ত হয়ে মানুষের পদক্ষেপের উপযুক্ত হয়ে উঠ্‌ত।

আর শুধু মানুষই ত' নয়। এখানে শুভাগমন হবে—গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীর বিগ্রহের। এইখানে আসল যে ভিটা—সেটা সারা বছর জঙ্গলে ঢাকা থাকলেও—এই সময় তার সংসার সাধন করা হত। নতুন করে মাটি ফেলা হত সেই ভিটিতে। একটি ছোট-খাটো ঘরও তৈরী করা হত এই ভিটের ওপর। সেই জন্যই ত' এর নাম দোল-ভিটি। সব বিগ্রহ এই ঘরে এসে অধিষ্ঠিত হবেন। তারপর চল্‌বে অষ্ট-প্রহরব্যাপী কীর্ত্তন আর হোলি-খেলা।

আড়াই বছরের ছেলে থেকে আশী বছরের বুড়োর সাদা দাড়ি পর্য্যন্ত রঙীন হয়ে উঠ্‌বে। বয়সের তারতম্য থাকবে না আর এই একটি দিন। সেই এক দিনের জন্যে গ্রাম যেন একেবারে বৃন্দাবনে পরিণত হত।

আমাদের ছেলেবেলায় গ্রামের যে আবহাওয়া দেখেছি—সেই পরিবেশে ভদ্রলোকদের বাড়ীর ছেলে-পেলেরা পল্লী অঞ্চলের বয়স্ক মালি, ঢুলি, কামার, কুমোর, তাঁতি জোলাদের খুড়ো, জ্যাঠা, মামা, দাদু, ঠাকুর্দ্দা এইসব নাম ধরে ডাক্‌তো। খুব যে একটা ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে ভাব—তা কিন্তু আমরা দেখিনি!

সেইজন্যে দোলের দিনের উৎসবে—যে সব মালি, ছুতোর, অথবা মালাকর ভালো খোল বাজাতে পারতো—তাদের আদর হত সব চাইতে বেশী। জাতিভেদকে শিকেয় তুলে রেখে সবাই কীর্ত্তনানন্দে মেতে উঠত। একেবারে যাকে বলে্‌ গলাগলি ভাব।

অন্দর মহলেও মালি-বৌ, ছুঁতোর বাড়ীর মেয়ে কিম্বা ধোপা বাড়ীর গিন্নি আবির নিয়ে এসে পাড়ার গিন্নি-বান্নিদের আবির দিয়ে যেতো। খুব একটা হৃদ্যতা আর আপনা-আপনির ভাব দেখেছি—সমাজের বিভিন্ন স্তরে। সে সমাজ ভেসে গিয়েছে, সে গ্রাম আর নেই, যাও বা আছে—পরস্পর পরস্পরকে শুধু অবিশ্বাসই করে, কাউকে আপনার বলে কাছে টেনে নেয় না!

দোলের দিন প্রত্যেক বাড়ীতে ভোগ দেওয়া হত—জনার্দ্দন, গোপীনাথ কিম্বা দামোদরকে! সে ভোগ একেবারে নিরামিষ। এই ভোগ উপলক্ষে কত রকম পদ যে রান্না হত—সে-কথা আজও মনে পড়ে। শাক, শুক্তো, ডাল তিনচার রকম, ভাজা নানা রকম, লাব্ড়া, রসা, ইচোরের তরকারী, ছানার ডালনা, ভাত, খিচুড়ি, লাউয়ের তরকারী, কচুর ঝাল, আলু পটলের ডাল্না, ঘীভাত, চাট্নি, অম্বল লুচি-পায়েস ও নানাবিধ পিঠে। এছাড়া থাক্তো সাকরাইলের বিখ্যাত চম্চম্। খাওয়ার সুখটা দেশে তখন খুবই ছিল।

তাই আমরা দেখতে পেতাম—দোলে একদিকে ছিল খাওয়া-দাওয়ার ঘটা আর দিকে ছিল—হোলি খেলার হুল্লোড়।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, গ্রামে তখন অভাব খুব কমই ছিল। প্রত্যেকেরই জমিদারী, জমি-জমা আর নগদ টাকা ছিল। প্রত্যেক বাড়ীর কর্ত্তারাই বসে বসে খেতেন, কাউকে বিশেষ উপার্জ্জন করতে দেখিনি আমরা।

দোলের পর যে উৎসবটা আমাদের গ্রামকে মাতিয়ে তুল্তো তার নাম হচ্ছে বাসন্তী পূজো। বাসন্তী পূজো ঠিক দুর্গোৎসবের মতোই, তবে দুর্গাপূজো যেমন গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে হত—বাসন্তী পূজোর বেলায় কিন্তু তা নয়। নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি বাড়ীতে এই বাসন্তী পূজো প্রচলিত ছিল। কিন্তু উৎসবের জাক-জমক্—এবং খাওয়া-দাওয়ার ঘটা কিছুমাত্র কম ছিল না। যে কয়টি বাড়ীতে বাসন্তী পূজো হত—ঢাকের বাদ্যে

পাড়ার ছেলেরা সেইখানে গিয়ে হাজির হত। অনেক সময় বাসন্তী পূজো উপলক্ষে নাটকও অভিনীত হত।

আমরা ছেলেবেলায় গ্রামে আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছি যে, যে বাড়ীতে বিষ্ণু পূজো চল্‌ছে সেইখানেই আবার শক্তি পূজোর আয়োজন হচ্ছে। এই পূজোর ব্যাপারে কোনো বিরোধ ছিল না। মোট কথা, গ্রামের মানুষেরা বারো মাসে তের পার্ব্বণ নিয়ে মেতে থাকতে চাইতেন। একটা কোনো পূজো পার্ব্বণকে উপলক্ষ করে সারা গ্রামের লোককে আনন্দ দেয়া। এতে কামার, কুমোর, মালাকর, ঢুলি, নাপিত, ধোপা, জেলে, মাঝি—সবাইকার কিছু কিছু উপার্জ্জন হত। বাসন্তী-পূজোর সময় রাম নবমীর মেলা হত পাশের সন্তোষ গ্রামে। আমরা ছোটরা দল বেঁধে যেতাম এই সন্তোষ গ্রামে—মেলায় সওদা করতে। সন্তোষ আমাদের পাশের গ্রাম। রাণী দিনমণি ও জাহ্নবী চৌধুরাণীর আবাস স্থল। আমাদের ছেলেবেলার এই সন্তোষ জাহ্নবী স্কুলের খুব সুনাম ছিল। দূর-দূর অঞ্চল থেকে ছেলেরা এসে স্কুলে ভর্ত্তি হত, অনেকে সংলগ্ন বোর্ডিং-এও থাক্‌তো।

আমাদের গ্রাম থেকে সন্তোষ যেতে হলে মাঝখানে একটি খাল পড়ে। এই খালটি হচ্ছে আমাদের গ্রামের দক্ষিণদিকের সীমানা। এই গাইজ্যা বাড়ীর খালের কথা আগেও বলে থাকবো। বর্ষাকালে নৌকো করে এই গাইজ্যা বাড়ীর খালে সান্ধ্য-ভ্রমণ ছিল আমাদের একটি অফুরন্ত আনন্দের উৎস। কিন্তু গ্রীষ্মকালে খালের জল একেবারে শুকিয়ে যেতো, তখন আমরা সবাই হেঁটে পার হয়ে যেতাম।

রাম-নবমীর মেলাতে আমরা গাঁয়ের ছেলেরা দল বেঁধে যেতাম। দল বেঁধে মেলা দেখার মতো মজা আর নেই। আমাদের দলে থাক্‌তো—নয়া-বাড়ীর নির্ম্মল আর ফটিক, পুরাণ বাড়ীর প্রাণশঙ্কর ও কৃষ্ণশঙ্কর, অমিয় আর নাটু, অনন্ত সেন, টোনা ঠাকুর, চারু, কান্তি, বদন-দা, দাদা, নরা সেন, মুইচা, এমনি গাঁয়ের আরো অনেকে।

চকের বাড়ীর সাম্‌নের লম্বা সড়ক দিয়ে দল বেঁধে আমরা রওনা হতাম। চল্‌তি পথে অনেক সময় চকের বাড়ী থেকে বুটুকে ডেকে

নিতাম দলে। অনেক সময় হেঁড়ে গলায় সবাই গান ধরতাম। সে গান শুনে আশে-পাশের গাছ থেকে পক্ষী-পাখালীর দল ভয় পেয়ে ডানা ঝট্‌পট্‌ করে উড়ে পালাতো।

আজকাল আমরা শহর অঞ্চলে কত প্রদর্শনী দেখি, কিন্তু ছেলে বেলায় গ্রামাঞ্চলের মেলার আকর্ষণ ছিল আমাদের কাছে সব চাইতে বেশী। এখনো চোখ বুঁজলে মনের-মুকুরে সেই মেলার ছবি ফুটে ওঠে।

এই মেলা সম্পর্কে ঠাকুর রামকৃষ্ণ একটি বড় মজার কথা বল্‌তেন। দূর থেকে মেলায় শুধু একটা হৈ-হৈ শব্দ শোনা যায়। যেন ডাকাত পড়েছে। তারপর হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে মেলার কাছে এসো, মেলার ভেতরে ঢুকে যাও—তখন শুন্‌বে সবাই দর দস্তুর করছে।—এই চুড়ির জোড়া কত? সাড়ী কি দরে বিক্রি করছ? একসের বাতাসা দাও আমায়। এমনি নানান্ কথা তোমার কানে এসে ঢুকবে।

আমাদের ছেলেবেলার এই রাম-নবমী মেলাও ঠিক তাই। দূর থেকে—যখন সড়ক বেয়ে চল্‌তাম—তখন শুন্‌তে পেতাম যেন—শব্দের ঢেউ কখনো উত্তাল হয়ে উঠ্‌ছে, আবার কখনো নেমে আস্‌ছে। তারপর আরো কাছে—আরো কাছে—একেবারে মেলার দোর গোড়ায়!

প্রথমেই চোখে পড়তো রাশি রাশি গরুর গাড়ী সব খালি অবস্থায় মাটিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। দূর দূর অঞ্চল থেকে জিনিষ-পত্র এসেছে এই সব গাড়ীতে। আবার মেলা শেষ হয়ে গেলে অবিক্রীত মাল নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে যাবে।

সার সার টিনের ছায়লা তৈরী করে তার ভেতর তেলে ভাজা জিলিপীর প্রচুর আয়োজন করা হয়েছে। গ্রাম দেশের মেলার এইটেই হচ্ছে সব চাইতে বড় আকর্ষণ। মেলায় গিয়েছ অথচ গরম তেলে ভাজা জিলিপি খাও নি—এ যেন কেউ ধারণাই করতে পারে না। সেই জন্যে ওই খানেই যত ছেলে-পেলের ভীড়। যে যা পার্ব্বণী পেয়েছে—তার অর্দ্ধেক ওই খানেই খরচ করে ফেল্‌বে।

আর একটি লোভনীয় বস্তু হচ্ছে—চিনির সাজ আর ফেণী-বাতাসা। ওইখানে আবার কুঁচো-কাঁচার ভীড় বেশী। সবাইকার হাতে চিনির সাজ আর ফেণী-বাতাসা। কুড়-মুড় করে খাচ্ছে আর পথ চল্‌ছে।

চলো, এইবার খেল্‌নার দোকানগুলো দেখে নি। প্রথমে মাটির খেল্‌না। হাতি, ঘোড়া, মন্দির, মঠ, আহ্লাদী পুতুল, রাধা-কৃষ্ণ, গণেশ, আরো নানা রকম ঠাকুর-দেবতা, এক পয়সা করে দাম। যে সব ছেলেমেয়ে দল বেঁধে মেলায় এসেছে—তাদের কেউ-বঞ্চিত হবে না।

ওই যে একটি ছোট্ট মেয়ে—ডুরে সাড়ী পরণে—কপালে তেল চপ্‌-চপ্‌ করছে ঝুটি করে খোঁপা বাঁধা—ও তাকিয়ে আছে খেল্‌না-গুলির দিকে। কৃষাণ বাড়ীর ছোট্ট মেয়ে ও। ঠাকুমাকে অনেক বলে-কয়ে দুটি পয়সা পার্ব্বণী আদায় করেছে। এখন ভাব্‌ছে, তেলে-ভাজা জিলিপি খাবে—না, পুতুল কিনবে। অবশেষে পুতুল কেনাই ঠিক করলে মেয়েটি। ওর ছোট ভাই জ্বরে বিছানায় শুয়ে আছে—। সে দিদি হয়ে ত' খালি হাতে বাড়ী ফিরতে পারে না! যখন ছোট ভাই কচি-কচি হাত এগিয়ে দিয়ে বল্‌বে,—দিদি, তুই মেলা থেকে আমার জন্যে কি এনেছিস? তখন সে এগিয়ে দেবে একটি মাটির ঘোড়া আর একটি আহ্লাদী পুতুল। ছোট ভাইটির মুখে আজ সে হাসি ফোটাবে।

এর পর কাঠের তৈরী সব খেল্‌না। ছোট ছোট কাঠের টুক্‌রো কেটে দিশী ছুঁতোর-মিস্ত্রিরা তৈরী করেছে। তারপর খুব টক্‌টকে রঙ লাগানো হয়েছে। যারা মেলায় এসেছে, আর যারা আসেনি—এই দুই শ্রেণীর জন্যে সেখানেও দারুণ ভীড়।

নাগরদোলা আর কাঠের ঘোড়ায় চড়বে? ওই যে, ওখানে বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে। ছেলেরা দু'জন-চারজন করে উঠ্‌ছে, ঘুরছে আর নামছে। ওখানেও ছেলে-মেয়েরা জমেছে মন্দ নয়।

খাঁচায় পোরা পাখী এসেছে কত! টিয়া, ময়না, চন্দনা, শালিক, কাকাতুয়া আরো নাম না-জানা কত পাখী। পাখী পোষার একটা রেওয়াজ আছে পল্লী-অঞ্চলে।

ঐ দেখ ওধারে সার্-সার্ উনুন জ্বালিয়ে মুড়ি আর খৈ ভাজা হচ্ছে। যেন মুড়ি আর খৈয়ের পাহাড় হয়ে উঠেছে।

এরপর চুড়ির দোকান। কত রকম চুড়ি সাজানো রয়েছে থরে থরে। কাচের চুড়ি, বেলোয়াড়ী চুড়ি গালার তৈরী চুড়ি। কৃষাণ বৌদের সেখানে খুব ভীড় হয়। এ ছাড়া নানা রকম দোকান-পশার সাজিয়ে বসেছে লোকে। সৌখীন দোকান—সেখানে মেয়েদের চুনের ফিতে, কাঁটা, তরল আল্‌তা, টিপ, কুম্‌কুম্ ইত্যাদি মেলে।

দু'পা এগিয়ে গিয়ে গামছার দোকান। তার পাশেই ধুতি আর শাড়ীর দোকান। বাসনের দোকান রয়েছে একটা কোণ ঘেঁসে। হাঁড়ি-কুড়ির দোকানও এসেছে প্রচুর।

আমাদের দলের মধ্যে অমিয়র দৃষ্টি ছিল চিড়ে আর গুড়ের দিকে। ও কোন ফাঁকে সকলকার কাছ থেকে দু' এক পয়সা করে আদায় করে চিড়ে-গুড় আর নারকেল নিয়ে আসতো। ভীড় থেকে একটু তফাতে আমরা সবাই গোল হয়ে বসে এই চিড়ে গুড় চিবুতাম। ক্ষিদের মুখে সেই চিড়ে গুড় যেন অমৃত বলে মনে হত।

ধীরে ধীরে আঁধার ঘনিয়ে আসত। প্রত্যেক দোকানের সাম্‌নে ভীড় আরো জমাট বেঁধে উঠত। মুসলমান পল্লীর লোকদের দেখতাম কালো হাঁড়ি কিনে—তাই জিলিপিতে ভর্ত্তি করে হাসিমুখে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। হিন্দুদের পালা-পার্ব্বণের মেলায় তখন মুসলমানরাও আনন্দের সঙ্গে যোগদান করত। মনে তাদের কোনো ময়লা থাকৃত না।

প্রতি মেলায় আমি ছেলেবেলায় একটি করে ধারালো ছুরি কিন্‌তাম! অন্য কিছু কিনি বা না কিনি—ছুরি একখানি অবশ্য চাই।

এইবার নিজেদের কেনা-কাটার পালা শেষ করে আমরা গ্রামের পথে পা চালিয়ে দিতাম।

মেলার কোলাহল আর গরম থেকে বেরিয়ে এসে যখন মাঠের পথ ধরতাম—ঝিরঝিরে হাওয়া আমাদের সকলকার দেহ-মন একেবারে জুড়িয়ে দিত। কি ভালোই যে লাগতো তখন।

আমরা আবার সমবেত সুরে গান ধরতাম। সে গান একটানা চলত গাইজাবাড়ীর খাল ছাড়িয়ে গাঁয়ের প্রস্নুতলা অবধি।

এই প্রস্নুতলায় একটি বটগাছ ছিল। আর সেই বটগাছের জন্মের একটা মজার ইতিহাসও আছে। আমাদের রাঙা তরফের কাকা প্রতাপ সিংহ, সেনেদের বাড়ীর সুরেন সেন এবং ঠাকুরবাড়ীর নলিনী চক্রবর্ত্তী এই তিনজনে খুব বন্ধুত্ব ছিল। তাঁরা তিনজনে মিলে একটি বটগাছের চারা সদর রাস্তার তিন মাথার মোড়ে লাগিয়ে দেন। কালে সেই বটগাছটি খুব বড় হয়। আমাদের গ্রামের ওপর দিয়ে যারা টাঙ্গাইল যেত কিম্বা সন্তোষ থেকে বাজার করে ফিরে আস্‌তো তারা এই বটগাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতো। বিকেল বেলা আমরাও কখনো কখনো গিয়ে জড় হতাম সেই বটগাছের নীচে। প্রতাপের 'প্র', সুরেনের 'সু' এবং নলিনীর 'ন' নিয়ে এই "প্রসুন" তলার নামকরণ করা হয়।

অনেকদিন পরে আমরাও এই পন্থা অনুসরণ করে আর একটি বটগাছ পুঁতেছিলাম—ঠিক ওর উল্টো দিকে টাঙ্গাইলের সড়কের মাথায়। সে গাছটিও এখন বেশ বড় হয়েছে। যে বছর পাকিস্তান হয়—তার পরের বছর গিয়েও দেখে এসেছি—গাছটি বেশ উঁচু ও ঝাপড়া হয়েছে। ছায়া আর আশ্রয় দান করছে পথিকদের। এই গাছটি বীরেন কাকা, ছুলাল, সেনেদের বাড়ীর ক্ষীরোদদা, ননীদা এবং আমি পুঁতেছিলাম। এই বটগাছ তলার অবশ্য কোনো নামকরণ করা হয়নি। এই দলের ননীদা আর আমি ছাড়া আর কেউ এখন বেঁচেও নেই!

গ্রামের যে পালা-পার্ব্বণের গল্প করছিলাম—আবার সেই পথে ফিরে যাওয়া যাক্।

রাম নবমীর পর আমাদের গ্রামের উল্লেখযোগ্য উৎসব ছিল—পাটঠাকুর নামানো। অর্থাৎ গাজনের উৎসব।

কাঠ দিয়ে যে ঠাকুর তৈরী করা থাক্‌তো—তারই নাম পাটঠাকুর। সারা বছর এই ঠাকুর বিশ্রাম লাভ করতেন। চৈত মাসে তার জাগরণের পালা। এ যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ!

চৈত মাসে চারদিকে ঢাকের বাদ্যি শুন্‌লেই আমরা বুঝতে পারতাম যে, পাট-ঠাকুর নামানোর পালা আস্‌ছে।

রুক্ষ চুলে গাজনের সন্ন্যাসীর দল—বাড়ী বাড়ী ভিক্ষেয় বেরুতো, আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাক্‌তাম—তাদের দিকে।

মহাদেবের নামে সারা গ্রাম মুখরিত হয়ে উঠত। এরা দল বেঁধে ভিক্ষেয় বেরুতো। বাড়ী বাড়ী জুটতো চাল, ডাল, বেগুন, আলু, কলা, এই সব।

গভীর রাত্রে এক ঘুম দিয়ে যখন জেগে উঠতাম—কান পেতে শুন্‌তে পেতাম—অনেক দূরে ঢাক বাজছে। পালি-জাগানোর মহড়া দিচ্ছে ওরা রাত জেগে।

পালি-জাগানোর ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা দরকার। পাঠ-ঠাকুর নামানো হয়ে গেলে সেই দারু-মূর্ত্তি-মহাদেব এক এক রাত্রে গ্রামের এক এক বাড়ীতে অতিথি হতেন। সেই উপলক্ষে "পালি-জাগানো" প্রথা প্রচলিত ছিল। কালী নাচ, মহাদেব নাচ, নানা রকম রঙ তামাসা, গ্রামের উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে ছড়া কাটা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ করা এইসব চল্‌ত—সারা রাত ধরে। এই উৎসবকেই বলা হত 'পালি-জাগানো।' মুখোস পরে যে কালী নাচ ও মহাদেব নাচ দেখানো হত—তাই দেখবার জন্যে গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বণিতার উৎসাহের অন্ত ছিল। সারা রাত জেগে তারা এই নাচ উপভোগ করত। ঢাকের তালে-তালে যখন সেই নাচ স্নুরু হত—তখন সকলেই মনে মনে একটা উন্মাদনা বোধ করত। বিশেষ করে মা কালী যখন খড়্গ হাতে সৃষ্টি ধ্বংস করতে উন্মাদিনীর নৃত্য স্নুরু করত—তার চুল পড়ত এলিয়ে, ঘন ঘন খড়্গ ঝল্‌সে উঠত আলোতে, আর দ্রুত ঢাকের তালে একটা সর্ব্বনাশের ইঙ্গিত পাওয়া যেত—! সেই সময় মহাদেব ছুটে এসে মাটিতে শুয়ে পড়ত। মা কালী শিবের বুকে পা দিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত! তার সর্ব্বনাশা নাচ থেমে যেত। এতক্ষণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা এই নৃত্য দেখছিল, এইবার মা কালী শিবের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে—সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতো।

আজকাল আমরা শহর অঞ্চলে লোকনৃত্য আর লোক-সঙ্গীতের নামে নেচে উঠি। আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি তার আসল বস্তুটি লুকিয়ে ছিল—আমাদের গ্রামের 'পালি-জাগানোর মধ্যে। গ্রামের কবিরা মুখে মুখে কবিতা আর ছড়া রচনা করত। প্রশ্ন করা হত, আর সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দেয়া হত কবিতাতে। গ্রাম্য কবিরা এক একটা পালা রচনা করত—তাই সুর-সংযোগে গাওয়া হত—এই পালি জাগানোর উৎসবে।

আমাদের দেশ "ময়মনসিংহ গীতিকার" দেশ। স্বর্গীয় দীনেশ সেন মশাই তার অনেক কিছু উদ্ধার করে রেখে গেছেন। কিন্তু গ্রামে গ্রামে এই জাতীয় কত পাল্া যে হারিয়ে গেছে কে তার সন্ধান্ দেবে?

এই মুইচ্যা মালীর কথাই ধরা যাক্ না!

মুইচ্যা আমাদের মুন্সী বাড়ীর চাক্রাণ-মালী ছিল। সে তার দৈনন্দিন রূপ। উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে, ঘরের দাওয়া মাটি দিয়ে বেঁধে লেপে দিচ্ছে, বেশী সাপ-কোপোর ভয় হলে বাড়ীর পেছন দিক্কার জঙ্গল সাফ করছে। রোজই ত' তাকে চোখের সাম্নে দেখ্তে পেতাম এইরূপে। কিন্তু এই মুইচ্যা মালীই যখন কালীর সাজ দিয়ে মুখে মা-কালীর মুখোস লাগিয়ে কালীর সর্ব্বধ্বংসী নাচ নাচ্তো—আশে-পাশের দশটা গাঁয়ের লোক অবাক্ হয়ে সেই নৃত্য উপভোগ করতো। নাচের তালে-তালে সবাইকার মন নেচে উঠ্ত! বৌ-ঝিরা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ঘোম্টার আড়ালে তাকিয়ে থাক্তো। ছোটরা ঘুমের ভেতরও সেই নাচের স্বপ্ন দেখে শিউরে উঠত। লোক-নৃত্যের সত্যিকারের শিল্পী ছিল এই মুইচ্যা মালী। আজও তার কথা ভুল্তে পারিনি।

কত পালি-জাগানোতে দেখেছি—তার কালী নাচের পর লোকেরা ছুটেছে ওর পায়ের ধূলো নিতে। তখন আর সে চির-পরিচিত মুইচ্যা মালী নেই, গ্রামবাসীর চোখে সে কালীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে! মনে পড়ে ছেলেবেলাকার গদাধরের কথা। যাত্রাদলে মহাদেব সেজে তাঁর সেই ভাবাবেশ! এমনি ধার্ম্মিক আর রসিক মানুষ তখনকার

দিনে—প্রতি গ্রামেই লুকিয়ে থাক্‌ত! কে তার সন্ধান রাখ্‌ছে বলো?

পাটঠাকুর নামানোর উৎসবে আমরা ছোটরা আর একটি ব্যাপার ভয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতাম।

গাজনের সন্ন্যাসী যাঁরা হত—তারা প্রত্যেকেই আমাদের চেনা মানুষ। ওই ঘোলই, গিরি, ঝড়ু পার্ব্বতি, কুইনা, খোকা আরো অনেকে।

দুর্গা পূজোর সময় এদেরই মণ্ডপে দেখেছি—'সংযমী' হতে।

এরাই আবার দল বেঁধে গাজনের সন্ন্যাসী হত। তখন দেখেছি এদের অন্যরূপ।

হে ভৈরব—হে রুদ্র বৈশাখ—!

পিঙ্গল—ভয়াল জটাজাল এদের চেহারায় যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠত। তখন এই গাজনের দল—আমাদের কাছে থেকেও অনেক দূরে চলে যেতো। দিনের পর দিন ওদের কৃচ্ছ্র সাধন আমাদের বিস্মিত করে রাখ্‌তো। আমরা ছোটরা—চোখ বড়-বড় করে ওদের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তাম।

ভয়ের যে ব্যাপারটা ঘটত—তারই কাহিনীটা বল্‌ছি।

এক ঘন-অন্ধকার নিশীথ রাত্রে এই গাজনের সন্ন্যাসীর দল—পাট-ঠাকুরের পুজো করবার জন্যে সমবেত হত শশ্মানে। মহাদেব ত' শ্মশানে-মশানেই ঘুরে বেড়ায়, তার চ্যালা-চামুণ্ডা—ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানার দলও শশ্মানের অধিবাসী। তাই পাট-ঠাকুর নামানোর ব্যাপারে শ্মশান-পূজো একটা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান।

এই শ্মশান পূজোর পর পুরোহিতের ওপর মহাদেব এসে ভর করত। তাই দেখবার জন্যে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীরা দল বেঁধে সেখানে গিয়ে হাজির হত। মহাদেব-ভর-করা অবস্থায় গাঁয়ের লোকেরা নানারকম অষুধ-বিষুধের জন্যে প্রশ্ন করত এবং তার উত্তরও পেতো। কোন্ বৌয়ের ছেলে হয় না তার জন্যে বুড়ীরা গিয়ে অষুধ চাইত, কে শূলবেদনায় কষ্ট পাচ্ছে—কিসে সারবে তার জন্যে ধর্ণা দিয়ে গিয়ে পড়ত। কার

গাই বিয়োলে বাছুর মরে যায়—তার জন্যে চাই শেকড়-বাকড়। কে জগন্নাথ দর্শন করতে চায়—কপালে ঘটবে কিনা তারই প্রশ্ন। নাতি হয়ে বাঁচে না কার—বৌয়ের জন্যে চাই মাদুলী।

এই জাতীয় সব কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হত—সেই মহাদেব-ভর-করা পুরোহিতকে। গাঁয়ের লোক একে বল্‌ত—"বায়াল ধরা।" এই বায়াল ধরার সময় তার নাকি ঐশ্বরীক শক্তি লাভ হত। অনেক কিছু ভবিষ্যৎ-বাণীও সে করে দিতে পারত!

প্রসূতির ছেলে হবে কি মেয়ে হবে, এ বছর ধান কেমন হবে? বন্যার ভয় আছে কিনা? গুপ্তধন পাবে কিনা, যে লোকটি দীর্ঘকাল অসুখে ভুগছে—সে ভালো হয়ে উঠ্‌বে কিনা—এই জাতীয় বহু প্রশ্নের উত্তর তাকে জোগাতে হত! গ্রাম দেশে কৌতূহলী লোকের অভাব নেই—কাজেই প্রশ্নও আস্‌ত নানা ধরণের।

এই রকম একটি শ্মশান-পূজোয় উপস্থিত হয়ে—একটি মজাদার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমার সোনাদা একবার ভারী মুস্কিলে পড়েছিল!

সোনাদার সখ ছিল ময়ূর পোষার। সেই ময়ূরের ডিম হত, কিন্তু বাচ্চা হলে একবারও বাঁচতো না। সোনাদা যখন অনেকবার চেষ্টা করেও বাচ্চাদের বাঁচাতে পারলো না, তখন একবার মরিয়া হয়ে এই শ্মশান পূজোয় গিয়ে হাজির হল। নানালোকে নানারকম প্রশ্ন করছে, সোনাদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, আচ্ছা, আমার ময়ূরের বাচ্চা বাঁচবে কিসে? একটা ওষুধ-বিষুধ পাওয়া যায় না?

আর যাবে কোথায়?

যে পুরোহিত অন্য সকলের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল—সে যেন ঠিক ফোঁস করে উঠল।

—হুঁ! আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছ? ঠাট্টার আর যায়গা পাওনি?

এইভাবে মহা গালাগাল।

সোনাদা ত' অপ্রস্তুতের একশেষ।

একদিকে যেমন চৈত্ মাসের শুক্‌নো হলদে ধুলো ওড়ে, তেমনি অন্যদিকে গাজনের সন্ন্যাসী দলের গৈরিক বসনে সারা গ্রাম তাপদগ্ধ ঝরা পাতার রঙ ধারণ করে। আর সেই সঙ্গে চলে ঢাকের বাদ্যি। পাটঠাকুরকে দুধে স্নান করিয়ে, তেল সিন্দুর মাখিয়ে মাথায় করে সারা গ্রাম ঘোরা হয়। সে কী উৎসাহ আর উদ্দীপনা! ছেলেরা নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়ে এই দলের সঙ্গে টহল দিয়ে ফেরে! সেই উৎসব মুখর গ্রামের কথা আজও ভুলতে পারিনি! প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে এদের ঢাকের বাদ্যের তালে-তালে নেচে পালা গাইতে হত। সেই ছড়া আর গান পরে গাঁয়ের ছেলেদের মুখে-মুখে ফিরত!

তারপর প্রতি রাত্রেই 'পালি-জাগান' চলেছে। আজ এ বাড়ী, কাল সে বাড়ী, পরশু ও-বাড়ী।

মহাদেব—মহাদেব ধ্বনিতে সারা গ্রাম উন্মত্ত হয়ে উঠত!

চৈত মাসের সংক্রান্তির দিন আমাদের গাঁয়ে একটা মেলা বসত—এটা আর ভিন্ গাঁয়ে নয়, আমাদের গ্রামেরই একেবারে মধ্যিখানে।

বান্দু ঠাকুর্দ্দা গ্রাম সম্পর্কে আমাদের ঠাকুর্দ্দাই হতেন। তাঁর বাড়ী আর পুকুরের পাড় জুড়েই এই মেলা বসত। তাই এই মেলাতে গ্রামের ছেলেমেয়েদের আর উৎসাহের অন্ত থাক্‌তো না। মনোমোহন নিয়োগী এই বাড়ীর বড় সরিক। তিনিও সম্পর্কে আমাদের ঠাকুর্দ্দা। ইনি ময়মনসিংহ শহরে একদা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ও কংগ্রেসের দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাঁর বাড়ীর উঠোন জুড়েও দোকানী-পশারীরা এসে দোকান সাজিয়ে বসত! এই মেলাটা যেন আমাদেরই ঘরের মেলা—গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের এই রকমই ধারণা ছিল।

আমাদের যত খেলার সাথী ছিল সব একসঙ্গে জুটে আমরা এই মেলায় ঢুক্‌তাম। যেন সবাই বিশ্বজয় করতে বেরিয়েছি। এ যে আমাদের চির-পরিচিত জায়গা, আমাদের নিজস্ব এলাকা—তাই আর ভয়টা কিসের? বুক উঁচু করে সোজা পা ফেলে এগিয়ে যাবো। দোকানদাররা আমাদের কাছে যা-তা দাম চাইতে পারবে না। দর-

দস্তুরে না বনলে ছুটো কথা শুনিয়ে দিতে পারবো। নিদেন পক্ষে বড়দের ডেকে নিয়ে আস্‌তে পারবো—সালিশী করবার জন্যে।

দল বেঁধে আমরা কুড়মুড় চানাচুর ভাজা কিনতাম, তক্তা বিস্কুট কিন্‌তাম, "বুড়ীর মাথার পাকাচুল" সংগ্রহ করতাম,—তারপর সবাই মিলে পুকুরের ধারে বসে সব কিছুর সদ্ব্যবহার করা হত। বুড়ীর মাথার পাকাচুলটা সত্যি আমাদের কাছে লোভনীয় ছিল।

সেই অল্পে সন্তুষ্ট হবার সহজ মন কি আর আমরা খুঁজে পাবো?

গ্রামের বারো মাসের পালা-পার্ব্বণের বিবরণী ত' এক রকম শেষ হল। এইভাবে আমরা সারা বছর ধরে নানা উৎসবে মেতে থাক্‌তাম। তখনকার দিনে গ্রামের সকলের অবস্থাই বেশ সচ্ছল ছিল। ক্ষেতের ধান, বাগানের শাক-সব্জী, পুকুরের মাছ—এ সবে কারো অভাব ছিল না। এ ছাড়া প্রত্যেকেরই ছোটখাটো জমিদারী ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় তাই চাকুরী একটা বড় কাউকে করতে দেখিনি!

মামাবাড়ীর মণ্ডপ ঘরে একটি মানুষ সমান মাটির মূর্ত্তি ছিল। হঠাৎ দেখলে মনে হত বুঝি জ্যান্ত লোকই জোড়াসন দিয়ে বসে আছে—নিখুতভাবে তৈরী করা হয়েছিল মূর্ত্তিটি।

সবাই এঁকে বল্‌ত ধলাকর্ত্তা। ধলাকর্ত্তা এক সময়ে মামাবাড়ীর নায়েব ছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্মান ছিল কর্ত্তাদের চাইতেও বেশী। নৈলে কি আর লোকে মূর্ত্তি তৈরী করে মণ্ডপ ঘরে রেখে দেয়? মানুষকেই ত' লোকে ভালোবেসে, শ্রদ্ধা করে দেবতার আসনে বসায়। মামাবাড়ীতে ধলাকর্ত্তার সম্মান ছিল ঠিক সেই রকম। এই ধলাকর্ত্তার ছেলে কৃষ্ণকুমার সেন পরবর্ত্তীকালে বাঙলা দেশে জেলা জজ হন। এরই এক ছেলে মোহন সেন বহুকাল পরে আমার বিশেষ বন্ধু হয়। তার চেষ্টাতেই কল্‌কাতার শহরে রূপলাভ করে "সাকরাইল সম্মেলনী।" গত দাঙ্গার সময় ক্যাপ্টেন পি, কে, সেন নামে যে জনপ্রিয় চিকিৎসকটি গুণ্ডার গুলীতে নিহত হয়—সে আর এই মোহন সেন একই মানুষ। সে সব অন্য যুগের কাহিনী।

কিন্তু ছেলেবেলায় আমরা যে ধলাকর্ত্তার মাটির মূর্ত্তিটির দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাক্‌তাম—সে কথা বেশ মনে আছে।

মণ্ডপ ঘরে বারো মাসে নানারকম দেব-দেবীর পূজো হত। আমার মনে হত এই ধলাকর্ত্তাও বুঝি আর এক ঠাকুর। কিন্তু এই ঠাকুরের পূজো হতে কখনো দেখেনি! সেও আমাদের কাছে ছিল এক পরম বিস্ময়!

অনেক দূর দেশের লোক আর প্রজারা এসে নাকি এই ধলাকর্ত্তাকে জ্যান্ত মনে করে সেলাম দিয়ে দাঁড়াতো। মূর্ত্তিটি ছিল এমনি জীবন্ত। সত্যি কথা বল্‌তে কি তাঁর বসা ও তাকানোর ভঙ্গী, কাপড় পরা, ডান হাতে ধরা হুকোর নলটা সব কিছু ছিল এমন সুন্দর করে সাজানো যে, মাটির মূর্ত্তি বলে একবারও মনে হত না।

শিশু মনে এই মূর্ত্তিটি অনেকখানি ঠাঁই দখল করে নিয়েছিল! অনেক সময় ভাবতাম, ধলাকর্ত্তা যদি হঠাৎ কথা বলে ওঠে—তাহলে কেমন হয়?

আমার তিন পিশিমা। তার ভেতর এক পিশিমার বিয়ে হয়েছিল এই গ্রামেই। সে বাড়ীর নাম নয়া বাড়ী। পিশির বাড়ী বল্‌তে আমরা সেই বাড়ীকেই বুঝ্‌তাম। গ্রামের পিশেমশাইকে আমি অবশ্য দেখিনি। কিন্তু পিশিমার আদরের অভাব ছিল না। এই পিশিমার তিন ছেলে। বড় ছেলে পদ্মিনীমোহন নিয়োগী—দীর্ঘকাল দেশনেতা সুরেন ব্যানার্জ্জির "বেঙ্গলী" কাগজের সহ-সম্পাদক ছিলেন। পরে ইনি গৌরীপুর এস্টেটের ম্যানেজার হন। ইনিই প্রথন রবীন্দ্র নাথের স্বহস্ত লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনী আদায় করেন। সেটা আবার বহুকাল পরে প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় ছেলে কল্‌কাতায় কে, এম, নিয়োগী নামে সর্ব্বজন পরিচিত ব্যক্তি। 'রয়টারের' ইনিই প্রথম বাঙালী ম্যানেজার। চমৎকার অভিনয় করতে পারতেন। পূজোর সময় গ্রামে যখন অভিনয় হত—দূর-দূর অঞ্চলের লোক এঁর অভিনয় দেখ্‌তে ছুটে আস্‌ত! এঁর সঙ্গে আর একটি জুটি ছিল—শিবা আর রুক্মিনী। দুই সহোদর ভাই। কিন্তু ভূমিকা গ্রহণ করতেন

নায়ক-নায়িকার। এমন অপূর্ব্ব অভিনয় তাঁরা করতেন যে, শহর অঞ্চলেও তাঁদের তুলনা মেলা শক্ত ছিল! সত্যিকথা বলতে কি, সাকরাইল গ্রামের অভিনয়ের খ্যাতি বহু দূর-দেশ পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের বাড়ীর বাঁধা স্টেজের কথা আগেই বলেছি। সেইখানেই সব অভিনয় হত। আমার রাঙা-কাকা প্রতাপসিংহ নিয়োগী ছিলেন এই মঞ্চের প্রতিষ্ঠিতা ও পৃষ্ঠপোষক। এ-জন্যে তিনি নিজের জমিদারী থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন।

পিশির বাড়ীর কথা বল্‌ছিলাম। পিশির ছোট ছেলে রাখুদা বরাবর বাড়ীতেই থাক্‌তেন আর টাঙ্গাইল শহরে একটি প্রেস চালাতেন। তার নাম দিয়েছিলেন 'নিয়োগী-প্রেস'। এই নিয়োগী প্রেস বহুকাল সুখ্যাতির সঙ্গে চলেছিল। রাখুদা হাসির ভূমিকায় অদ্ভুত অভিনয় করতে পারতেন। এ-বিষয়ে তার খ্যাতি ছিল অসাধারণ।

আমাদের পিশতুতো বোন বেঙীদি আমাদের চাইতে বয়সে অনেক বড়ো। তিনি খাওয়াতে খুব ভালো বাসতেন। ভাই ফোঁটার সময় তিনি গরম-গরম লুচি ভেজে আমাদের পাতে দিতেন। মনে রাখ্‌তে হবে—সে-সময় গ্রাম দেশে লুচির প্রচলন বিশেষ ছিল না। মিষ্টি, মাছ-ভাত এই সবই লোকে খাওয়াতে ভালো বাস্‌তো। বেঙীদি রসিকতা করে ফুল্‌কো লুচিকে বল্‌তেন 'ফুন্‌কো ফুচি।' এই কথা বলে আমাদের খুব হাসাতেন। রাজশাহী শহরে তাঁহার বিয়ে হয়েছিল।

আমাদের ছেলেবেলায় গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে খুব খাওয়া-দাওয়ার ধূম ছিল। যাঁরা প্রচুর খেতে পারতেন—তাঁদের মন্তব্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। ঔদরিকরা রটিয়ে দিয়েছিলেন যে, মুন্সী-বাড়ীর পায়েসে মিষ্টি বেশী হয়—আর নয়া-বাড়ীর পায়েসে মিষ্টি কম পড়ে। কথাটা গ্রাম দেশে খুব চালু হয়ে গিয়েছিল। আমরা বড় হয়েও দুই বাড়ীর রান্নার এই অখ্যাতির কথা শুনে খুব কৌতুক বোধ করতাম।

আমাদের এক জ্যাঠতুতো-ভগ্নিপতি বিমলা সেনের কথা আগেই বলেছি, খাওয়াতে এবং খাওয়ানোতে তাঁরও বিশেষ খ্যাতি

ছিল। তিনি নিজে একটি গোটা পাঁঠা অবলীলাক্রমে উদরস্থ করতে পারতেন।

আমাদের চকের বাড়ীর কাকা শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগীও খুব ভোজন-বিলাসী ছিলেন। তাঁর পক্ষেও একটা গোটা-পাঁঠা খেয়ে নেয়া কষ্টকর ছিল না। পরবর্ত্তীকালে আমাদের এই কাকা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরিচালিত "ফরোয়ার্ড" কাগজের সম্পাদক হয়েছিলেন এবং দীর্ঘকাল ধরে বেশ সুখ্যাতির সঙ্গে কাগজ সম্পাদন করেছিলেন। কিছুকাল তিনি অমৃত-বাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতাস্থ "সাকরাইল সম্মেলনের" স্থায়ী সভাপতি।

আমি যখন বেশ ছোট—সেই সময় একটি বিয়েতে বিরাট এক নৌকোর মিছিল দেখেছিলাম। সেই মিছিলের কথা আমার আজও মনে আছে।

আমাদের মুন্সী-বাড়ীর ছোট তরফের বীরেন কাকার বিয়ে। বর্ষা-কালে বিয়ে হয়েছিল। আমাদের ছোট খুড়িমার বাড়ী ঘারিন্দা। বিরাট নৌকোর মিছিল করে এই বিয়েতে বর-যাত্রীরা গিয়েছিল।

বাদ্য-ভাণ্ড, খাওয়া-দাওয়ার প্রচুর আয়োজন। কয়েকটি বজরা চমৎকার করে সাজানো হয়েছিল। আর হবেই বা না কেন? জমিদার বাড়ীর বিয়ে—একেবারে এলাহি কাণ্ড! আমরা তখন ছোট বলে এই বিয়েতে যাবার অনুমতি পাইনি! দূর থেকে মিছিল দেখেই খুশী থাক্‌তে হয়েছিল। বাড়ীতে নতুন বৌ এলে আমরা সবাই উঁকি মেরে দেখে এলাম—একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমার মতো দেখ্‌তে।

ছেলেবেলায় দেখেছি—বাড়ীতে দাদার জন্মতিথি উৎসব হত। খুব সকালে উঠেই দাদা নতুন কাপড় পরত, মণ্ডপ ঘরে দাদার কল্যাণে পূজো হত। জ্যান্ত মাছ আগের দিন রেখে দেয়া হত হাঁড়ির ভেতর। পুকুরের পাড়ে গিয়ে সেই মাছ দাদার হাতে তুলে দিত, আর দাদা

মাছটাকে পুকুরের জলে ছেড়ে দিত। মাছের জীবন দিলে—ছেলেও দীর্ঘায়ু হবে এইটাই ছিল বুঝি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

তারপর পরমান্ন রান্না হত। আমরা সবাই মজা করে খেতাম। ছেলেবেলায় দেখেছি—গ্রামের লোক পায়েসকে পরমান্ন বল্‌ত। পরম-অন্ন ত' বটেই—! যেমন সরু চালের সুগন্ধ, তেমনি খাঁটি মিষ্টি দুধ। আজকাল ছেলে-মেয়েদের পায়েসই জোটে না—পরমান্ন কোথায় পাওয়া যাবে?

দাদার জন্মতিথি-উৎসব দেখে, আমি মাকে কেবলি বিরক্ত করতাম,—মা, আমার জন্মতিথি কবে হবে?

আসল কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের বাড়ীর নিয়ম—জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই শুধু জন্মতিথি উৎসব হবে। সে আইন-কানুনের কথা ত' আমার জানা ছিল না, তাই মার কাছে কেবলি বায়না করতাম,—কবে আমার জন্মতিথি উৎসব হবে—জান্‌বার জন্যে!

অনেক কাল পর বেশ বড় হয়ে একদিন দেখি, দাদা-মশায়ের লেখা অনেকগুলি ডায়েরী রদ্দুরে শুকুতে দেয়া হয়েছে। সেই ডায়েরীর পাতাগুলি ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় চোখ পড়ল—আমার জন্ম দিন রবিবার, ৯ই কার্ত্তিক, ১৩০৯ সন।

আমাদের গ্রামে চঙ্‌ ওড়ানোটা ছোটদের কাছে একটি মজার ব্যাপার ছিল। 'চঙ্‌' কথাটা অন্যান্য অঞ্চলের ছেলেদের কাছে একটু অচেনা বলে মনে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে ছেলে-বুড়ো সবাই চঙ্‌কে বেশ ভালো করে চেনে আর ভালোও বাসে। 'ঘুড়ি' বল্‌লে যেমন সবাই এক ডাকে চিনে নেয়—'চঙ্‌ কিন্তু তেমন নয়। এক কথায় চঙ্‌ হচ্ছে বিরাট—বিশাল ঘুড়ি! মানে, একটা ঘুড়ির দশ-বারো গুণ বড়ো। বাখারী আর বেত দিয়ে এর বিরাট খাঁচা তৈরী হয়। তারপর খবরের কাগজ সেঁটে দিতে হয় সারা গায়ে। একটা বেতের ফালি এমন ভাবে মাথার কাছে যোগ করে দিতে হয়—যে উঁচুতে ওড়ালে এই চঙ্‌ অদ্ভুত শব্দ করে ডাকে। এই চঙ্‌ ওড়াতে হলে শক্ত পাটের দড়ির দরকার। দু'তিন জন জাঁদরেল লোক না হলে চঙ্‌

ওড়ানো কষ্টকর। তবে একবার অনেক উঁচুতে উড়িয়ে দিতে পারলে সারাদিন, সারা রাত ধরে বোঁ-বোঁ শব্দে তার অস্তিত্ব জানাবে। ছেলেবেলায় অনেক সময় গভীর রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে যেতো, শুন্‌তাম—কোন মাঠের ওপর বাতাসের প্রবল টানে চঙ্‌ গোঁ-গোঁ করে একটানা ডেকে চলেছে। চঙ্‌টা যেন একটা জ্যান্ত-জানোয়ার। ওকে জোর করে বেঁধে আকাশে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে—তাই ওর আর্ত্তনাদ কখনো থাম্‌ছে না।

রাখাল ছেলেরা গরু চরাতে গিয়ে মাঠের মাঝে বিরাট বিরাট চঙ্‌ উড়িয়ে দিয়ে বট-পাকুড়ের ডালের সঙ্গে দড়িটা বেঁধে রাখ্‌তো। সারাদিন ধরে শোনা যেত—তার গোঙানি! আজকের দিনের এরোপ্লেনের শব্দের মতো। অনেক সময় আকাশে ওড়া কালে—চিলের পা এই চঙের দড়িতে আট্‌কে যেত! রাখাল ছেলেরা একবার এই ভাবে একটি চিলকে নামিয়ে এনেছিল।

সবাই মিলে সেটাকে নিয়ে মাঠের মাঝখানে কী হুল্লোড়!

আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি কারো বাড়ীতে জামাই এলে সারা গ্রামে একেবারে হুলুস্থূল পড়ে যেতো। জামাই ত' শুধু এক বাড়ীরই নয়—গোটা গ্রাম তাকে জামাই-আদরে লুফে নিতো। জেলে ডেকে পুকুরে মাছ ধরা হচ্ছে, খাসা দৈয়ের বায়না যাচ্ছে—কাগমারীতে। এই কাগমারী যায়গাটা দৈয়ের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। আমরা ছেলেবেলায় ছড়া আওড়াতাম—

"সালি ধানের চিড়ো রে ভাই—
বিন্নি ধানে খৈ—
মোটা মোটা সবরীকলা
কাগমাইরা দৈ!"

খুব উপভোগ্য ফলার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই! সবরীকলা মানে মর্ত্তমান কলা।

গ্রামে জামাই আসার গল্প করছিলাম। টাঙ্গাইলের তাঁতের ধূতির

ফরমাস্ যেতো সকল বাড়ী থেকে। জামাই বাড়ী-বাড়ী গিয়ে গুরুজনদের প্রণাম করবে টাকা দিয়ে, সে টাকা ত' তক্ষুণি হাতে-হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে আর দিতে হবে—আশীর্ব্বাদী রূপে টাঙ্গাইলের বিখ্যাত মিহি ধুতি।

আর একটি প্রথা ছিল 'বাটা' দেয়া।

প্রত্যেক বাড়ীতে নানারকম ফলমূল মিষ্টি সাজিয়ে—প্রত্যেককে নেমন্তন্ন করে তাই পরিবেশন করা হত। এই প্রথার নাম "বাটা"। নতুন তৈরী বাসনে জামাইকে খাবার সাজিয়ে দেবারও নিয়ম ছিল।

যে কদিন জামাই গ্রামে থাকৃতো—তার নেমন্তন্নের কামাই ছিল না। ক্ষিদে থাক আর না থাক—প্রতি বেলায় এক-এক বাড়ীতে গিয়ে পাত পাড়তে হত। বুড়ীরা বলত "জামাইর নামে রন্ধন, সকলের ভোজন।" ব্যাপারটা দাঁড়াতোও ঠিক তাই। গ্রামের ছেলেরা এই সুযোগে প্রতি বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াতো।

সে কি মজার দিনই না গেছে।

মেঘিদি আর ছা-মাসির খুব অল্প বয়েসেই বিয়ে হয়েছিল। বাড়ীতে জামাই এলে আমরা পুকুরের মাছ, সন্দেশ, রসগোল্লা, চম্‌চম্, দৈ, পিঠে পায়েস ইত্যাদির মধ্যে যেন একেবারে ডুবে থাকৃতাম।

ছা-মাসির বিয়ের কথা বেশ মনে পড়ে।

এক সঙ্গে ওঠা বসা, এক সঙ্গে খেলা ধূলা, এক সঙ্গে পড়াশোনা··· হঠাৎ শোনা গেল, ছা-মাসির নাকি বিয়ে!

আমি, ছোকন, ছা-মাসি মামা-বাড়ীর বাইরের বৈঠকখানা বাড়ীর একটা কোনের ঘরে পড়তাম। ঝগড়া বাঁধতেও সময় লাগতো না, আবার ভাব হতেও দেরী লাগতো না! আমাদের কাছে ঝগড়া আর ভাব—ঠিক শরৎকালের মেঘ আর রদ্দুরের মতোই ছিল! সত্যিকথা বল্‌তে কি, মিল আর অমিলের মধ্যে আমরা এক বোঁটাতে তিনটি ফুলের মতোই ফুটে উঠেছিলাম।

সেই ছা-মাসি চলে যাবে আমাদের মাঝখান থেকে?

আমার ছা-মাসি, আর ছোকনে বুড়ির পিসী! কে সেই অচেনা

ডাকাত যে আচমকা এসে ওকে আমাদের মাঝখান থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে? এই নিয়ে আমাদের ভাবনার অন্ত ছিল না!

এখন থেকে খেলাঘরের খেলা আর জম্‌বে না, অঙ্ক না কষে কাটাকুটি খেলা আর চল্‌বে না, রাত্তিরে পড়বার সময় আমাদের আর একটি খেলা ছিল—একজন লণ্ঠনের আলো বাড়িয়ে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সেটাকে দেবে কমিয়ে! সেই সব প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানই বা কি করে চল্‌বে? সন্ধ্যেবেলা পড়তে পড়তে আমাদের মধ্যে কেউ একজন ঘুমিয়ে পড়লে দোয়াতের কালি দিয়ে দিব্যি পুরুষ্টু গোঁফ এঁকে দেয়া হত! এই সব মজাদার খেলা তা হলে এখন থেকে একেবারে বন্ধ!

ভেবে ভেবে রাত্তিরে আর আমাদের চোখে ঘুম নেই।

বিয়ে বাড়ীর নেমন্তন্নের যে প্রকাণ্ড একটা প্রলোভন সেটা ছাপিয়েও আমাদের দু'জনের মন ক্ষণে-ক্ষণে ভারী হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

সুরেশদা মামাবাড়ীর ছোট তরফের উঠোনটা বিয়ের জন্যে চাঁদোয়া খাটিয়ে কারু শিল্পে, কাগজের নক্সায় আর জাপানী লণ্ঠনে চমৎকার করে সাজিয়ে তুল্‌ছে—তাতেও আমরা উল্লাসে নেচে উঠ্‌ছি না।

গ্রামে নাকি এর পূর্ব্বে এত সুন্দর বিয়ের মণ্ডপ তৈরী হয় নি! এই কথা সবাই বলাবলি করছে, তবু আমাদের মন প্রবোধ মান্‌ছে কৈ?

উৎসবে সমারোহ হল প্রচুর। মা-মরা মেয়ের বিয়েতে ছোট আজামশাই দু'হাতে খরচ করলেন। কিন্তু কালো বর দেখে আমাদের কারো মন উঠ্‌ল না। বেশ মনে আছে—বাসি বিয়ের দিন সকালে ছা-মাসি যখন সাত পাক ঘুরছে—আমি সবাইকে আড়াল করে কেবলি তাকে চিমটি কাট্‌ছি। আর ছা-মাসি ঘোমটার নীচে চোখ বড়ো বড়ো করে আমার দিকে তাকাচ্ছে!

ভারী জব্দ! ও সময়ে ত ঝগড়া বাঁধাবার উপায় নেই!

এইভাবে ছেলেবেলার খেলাঘর আমাদের ভেঙে গেল! খেলার সাথীদের বিয়ে হয়ে যেতে—কাদার পায়েস ও পাতার লুচি আর মনকে

টান্‌তে পারে না! তখন খাঁচার পাখী বাইরের দিকে পাখা মেলে উড়তে চায়! মামাবাড়ীর গণ্ডীর মধ্যে তখন আর খেলা জমে না! নতুন পরিবেশে নয়া খেলার জন্যে মন আকুপাকু করে। এই সময় পশ্চিম বাড়ীর নরাসেন—কাঁচা মিঠে আমের সন্ধান দিলে।

এই ফাঁকে বাইরে বেরুবার সুযোগ পেলাম প্রথম।

মামা-বাড়ীর উত্তরদিকে যেমন,—দক্ষিণদিকেও তেমনি একটি পুকুর ছিল। দক্ষিণদিকের পুকুর উত্তরদিকের চাইতে আরও অনেক বড়। সেই পুকুরের অপর পারে—একটি কাঁচামিঠে আমের গাছ ছিল।

এই আবিষ্কারের সঙ্গে আমাদের চোখের সাম্‌নে একটি নতুন জগৎ খুলে গেল।

সবাইকে লুকিয়ে আমরা কয়েকজন এইখানে এসে হাজির হতাম। আমি কিন্তু গাছে উঠতে আদৌ জান্‌তাম না। তবে পল্লী-অঞ্চলে উৎসাহী ছেলের অভাব নেই! আমরা কোচড় ভর্ত্তী আম নিয়ে পালিয়ে আস্‌তাম। একদিন মামা-বাড়ীর এক প্রজা দেখতে পেয়ে আমাকে শাসিয়ে দিল, দাঁড়াও, কর্ত্তাদের কাছে এখুনি গিয়ে সব বলে দিচ্ছি।

সে-দিন কি ভয়ে-ভয়েই না কাট্‌ল। কখন এসে লোকটা নালিশ করে সেই দুশ্চিন্তা। লোকটা ভয় দেখিয়ে ছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এসে আমার নামে কোনো নালিশ জানায় নি।

পশ্চিম বাড়ীর নরা সেন খুব ছেলেবেলা থেকেই বেপরোয়া গোছের ছেলে ছিল। কোন্ বাড়ীর কোন্ গাছে কি ফল ফলেছে সেটা তার নখদর্পণে থাক্‌তো। একদিন এসে বললে, গুঠুদের বাড়ী চমৎকার জাম্বুরা (বাতাবী লেবু) হয়েছে। ও-গুলো হাতাতে হবে। গুঠুও আমাদের ছেলেবেলাকার বন্ধু। তার ভালো নাম মণি সেন। বর্ত্তমানে শ্রীনিকেতনের বয়ন বিভাগের একজন দায়িত্বশীল কর্ম্মী। রবীন্দ্রনাথ তাকে খুব স্নেহ করতেন এবং নিজে উৎসাহিত হয়ে গুঠুকে জাপানে পাঠিয়ে বয়ন-শিল্প সম্পর্কে শিক্ষাদান করে এনেছিলেন।

এই গুঠুদের বাড়ী চমৎকার বাতাবী লেবু হত। এমন মিষ্টি বাতাবী

লেবু সচরাচর পাওয়া যায় না। রামা আমাদের আর একটি বন্ধু। সে সুরেশ সেনের বড় ছেলে। এই ব্যাপারে রামার উৎসাহও বড় কম নয়। কিন্তু গুঠুর বাবা ভগবান সেনের চোখ এড়িয়ে একটি মাছিও সে বাড়ীতে ঢুক্‌তে পারে না!

এখন উপায়?

নরা সেন বললে, সেজন্যে চিন্তা নেই। ব্যবস্থা যা করতে হয় আমিই করবো। সত্যি, বাহাদুরী দিতে হয় নরা সেনকে। বীর হনুমান রাবণের চোখকে ফাঁকি দিয়ে, রাণী মন্দোদরীকে ভুলিয়ে, রাবণের মৃত্যুবাণ সংগ্রহ করে এনেছিল। আমাদের নরা সেনও ভগবান সেনের চোখে ধূলি দিয়ে কি ভাবে যে মিষ্টি বাতাবী লেবু সংগ্রহ করে নিয়ে এলো সে-কথা আমাদের কাছে আজও রহস্যজনক। আমরা অবশ্য গুঠুকেও সে-বাতাবী লেবুর ভাগ দিয়েছিলাম। সে একটুখানি খেয়েই চ্যাঁচামেচি সুরু করে দিলে।

—এ আমাদের গাছের বাতাবী লেবু। তোরা চুরি করেছিস্। এক্ষুণি বলে দিচ্ছি গিয়ে—শেষকালে অনেক কষ্টে নরা সেন তাকে ঠাণ্ডা করে।

বন্ধুরা নরাসেনকে ডাক্‌তো নরাপাঁঠা বলে। ওর গায়ে নাকি বোকা পাঁঠার মতো গন্ধ। কিন্তু নরাসেন সত্যি বন্ধুবৎসল ছিল। পূজোর জন্যে নারকেল সংগ্রহ করে খাটের তলায় রেখে দেয়া হয়েছে, নরাসেন তার থেকে একটি বেমালুম সরিয়ে নিয়ে এলো। তারপর বাতাসা দিয়ে দিব্যি বাল্য ভোগ সুরু হয়ে গেল। কোত্থেকে আক, কোত্থেকে সবরী আম (পেয়ারা), কোত্থেকে সবরী কলা নরাসেন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সংগ্রহ করত। আর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ফলার জমিয়ে তুল্‌তো। এতটুকু ভয়-ডর ছিল না এই নরা পাঁঠার। ওর দুর্জ্জয় সাহস দেখে আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম।

আরো বড় হয়ে এই নরা সেন যখন সন্তোষ স্কুলে পড়ে—তখন এক বিচিত্র "ভূত পূজোর" আয়োজন করেছিল। আমাদের গ্রামের একটি ছেলের ভয়ানক পরীক্ষার ভয় ছিল। পরীক্ষায় পাশ করবে

কি ফেল করবে এই দুশ্চিন্তায় পেটের ভাত হজম হত না, রাত্তিরে হত না ঘুম! সে এসে করিৎকর্ম্মা নরাসেনের শরণাপন্ন হল!

নরাসেন বহুক্ষণ চোখ বুঁজে কি ভাবলে। তারপর হঠাৎ পথের সন্ধান পেয়েছে এই রকম ভাব দেখিয়ে ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলে, হুঁ! হতে পারে।

—অ্যাঁ! হতে পারে? কি হতে পারে?

—কার্য্যোদ্ধার হতে পারে, কিন্তু বড় কঠিন কাজ।

—কি রকম কঠিন কাজ শুনি?

ছেলেটির চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা!

শিবনেত্র হয়ে নরাসেন গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে, ভূত পূজোর ব্যবস্থা করতে হবে। মহাদেবের চ্যালা ভূত-প্রেতরা যদি সন্তুষ্ট হয় তা হলেই তুমি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হতে পারবে।

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বল্লে, তা হলে ভূত পূজোরই আয়োজন করো।

নরাসেন তখনো নির্ব্বিকার।

বল্লে, পূজোর অনুপান চাই ত! এ সহজ ব্যাপার নয়। একেবারে ভূত পূজো। কলাটা-মূলোটা দিলেই কাজ উদ্ধার হবে না। শ্মশানে পূজোর ব্যবস্থা করতে হবে। একটি আস্তো পাঁঠা মারতে হবে। এ ছাড়া লুচি, পায়েস, মিষ্টি চাই। পূজোর জন্যে চাই—নরকঙ্কাল, ফল, ফুল, চন্দন, বিল্বপত্র। সে সব আমি সংগ্রহ করে নেবোখ'ন।

ইতিমধ্যে ছেলেটির মুখ ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু এত দূর এগিয়ে ত' আর পেছিয়ে আসা চলে না। তবু মুখ কাচুমাচু করে জিজ্ঞেস্ করলে, কত খরচ পড়বে?

নির্লিপ্ত ভাবে নরাসেন জবাব দিলে, পঞ্চাশ টাকার মতো পড়বে হয়ত!

তাও আবার হয়ত!

কিন্তু নরাসেনের দলটি ত' আর কম নয়! সবাইকারই উদর পূর্ত্তি হলে তবেই না ভূতপুজো সার্থক হবে।

কথায় বলে, গরজ বড় বালাই। ছেলেটি শেষ পর্য্যন্ত রাজি হয়ে গেল।

একটি ছেলেকে আগের থেকে শিখিয়ে-পড়িয়ে রাখা হল। সে অন্ধকারে গাছের ডালে লুকিয়ে থাকবে। নরাসেন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে সে ঠিক-ঠিক শেখানো মতো জবাব দেবে।

এই ভূতপূজোর পুরোহিত হল নরাসেন নিজে। লাল রঙের চেলি পরে, কপালে কাপালিকের মতো সিঁদুরের প্রকাণ্ড ফোঁটা দিয়ে অদ্ভুত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে পূজো শেষ করল নরাসেন।

ভূতপূজোর ভূরি-ভোজনের প্রচুর প্রয়োজন করা হয়েছিল। পূজা অন্তে যখন ভূতকে জিজ্ঞেস করা হল সে সন্তুষ্ট হয়েছে কি না—তখন গাছের ওপর থেকে এমন মারাত্মক শব্দ শোনা গেল যে, পূজোর জন্যে সমবেত ভক্তবৃন্দের দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। যার কল্যাণে পূজোর আয়োজন—সে ত' প্রায় মূর্চ্ছা যায় আর কি।

সেদিন গভীর রাত্রে অনেক জ্যান্ত ভূত যে গোগ্রাসে প্রসাদ গ্রহণ করেছিল, সেকথা বলাই বাহুল্য।

আমাদের গ্রামের কায়স্থ পাড়ায় দুটি ভক্তিমতী স্ত্রীলোক—স্বপ্নে বসন্তের অষুধ পেয়েছিল। প্রতি বছর এই দুটি বোন নানা উপকরণ দিয়ে সাদা সাদা বড়ি তৈরী করত। বসন্তের প্রাদুর্ভাবের আগে এই অষুধ খেলে আর কারো বসন্ত হত না। এই অষুধের খুব চাহিদা ছিল। নানা জায়গা থেকে লোক আস্‌তো এই অষুধ নিতে। এরা খুব ধুমধাম করে মা শীতলার পূজোর আয়োজন করত, আর তাতে বহু লোককে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতো। আমরা বড় হয়েও দেখেছি—দূর দূর অঞ্চল থেকেও অনেক মানুষ ডাকযোগে অষুধ নেয়ার ব্যবস্থা করত।

লোকে বলত, এই অষুধের গুণে নাকি আমাদের গ্রামে কখনো বসন্তের প্রকোপ হয় নি। আশে-পাশের বহু অঞ্চলে লোক বসন্তে আক্রান্ত হয়েছে—কিন্তু এই গ্রামে এই রোগের বিশেষ কোনো আক্রমণ দেখা যায় নি।

হয়ত বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করে প্রচুর প্রচারের ব্যবস্থা করলে

ওষুধটা ভালো ভাবেই চল্‌তো এবং বহু লোকের উপকার হত! কিন্তু সেই দুটি স্ত্রীলোকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে সম্ভাবনাও চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে।

ছেলেবেলায় এও দেখেছি—আমাদের গাঁয়ের বিভিন্ন পাড়ার বুড়ীরা নানারকম টোট্‌কা অষুধ জান্‌তো। ছেলেপেলেদের সাধারণ অসুখ-বিসুখ হলে তাদের কাছ থেকে সেইসব টোট্‌কা অষুধ জোগাড় করেই খাওয়ানো হত। কথায় কথায় ডাক্তার কোবরেজ ত' ডাকা হত না গ্রাম দেশে। তাছাড়া নানারকম গাছ-গাছড়াও লোকে ব্যবহার করতো প্রয়োজন মত। সর্দ্দি-কাসিতে শিউলী পাতার রস, হাত, পা ভেঙে গেলে হাড়মচ্‌কা গাছের পাতা, কেটে গেলে বিশল্য-করণীর পাতা, কিম্বা গাঁদা ফুলের পাতা লোকে হামেশা ব্যবহার করত। আমাশায় থান্‌কুনী পাতা লোকে ঝোলের সঙ্গে খেতো। ছেলেবেলায় ক্রিমির ব্যথায় আমি খুব কষ্ট পেতাম। মনে আছে, সেই সময় পেটে মৌলটার পাতা বেঁধে রাখা হত। ছেলে-পেলেদের খুব কাসি হলে বাসকের পাতার রস খাওয়ানো হত। দণ্ড-কলস বলে একরকম ছোট ছোট গাছ ছিল—তাও যেন কিসে ব্যবহার করা হত দেখেছি। মোট কথা সাধারণ অসুখ-বিসুখে গাছ-গাছড়ার ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে হত।

একবার আমাদের সখ হয়েছিল বাগান করবার।

প্রথমেই ইট সাজিয়ে নিজের নিজের অংশ আলাদা করে নিলাম। তারপর নানা গাছ থেকে ডাল কেটে নিয়ে এলাম। সেইগুলি মাটিতে পুঁতে—সকালে-বিকালে জল ঢাল্‌তে সুরু করে দিলাম। সে কী জল ঢালার ঘটা! কে কত ঘটি জল ঢাল্‌তে পারে—তাই নিয়েই প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেল।

হয়ত বেশী জল ঢালার জন্যেই গাছগুলি মরে গেল! বড় হয়ে শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি'তে পড়েছিলাম রামের অশ্বথ গাছ পোতার কাহিনী! আমাদের বাগান করার ইতিহাসও তার চাইতে কম চিত্তা-

কর্ষক ছিল না! কেননা—কাউকে সে গাছের কাছে এগুতে দিতাম না। পালা করে পোঁতা গাছগুলি পাহারা দিতাম সবাই। কিন্তু ছোটদের কি কিছু নির্ব্বিঘ্নে হবার যো আছে! সে বাগানে আর ফুল ফুট্‌ল না! ডালগুলি যখন রদ্দুরের তাপে একেবারে শুকিয়ে গেল—তখন রাগ করে তুলে ফেলা ছাড়া আর কি উপায় থাক্‌লো?

আজকের যুগের ছেলেমেয়েরা যেমন প্রচুর শিশু-মাসিক পড়তে পায়, পূজোর সময় পায় বহু রঙ-চঙা বার্ষিকী—আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু এমন মানসিক ভোজের ব্যবস্থা ছিল না। বেশ মনে আছে, গোটা গাঁয়ে একটিমাত্র ছোটদের মাসিক কাগজ আস্‌ত—তার নাম হচ্ছে "শিশু"।

এই শিশুর জন্যে আমরা সবাই দিন গুণতাম। অনেক সময় দল বেঁধে পোষ্টাপিসে গিয়ে পিয়নকে জ্বালাতন করতাম।

যতদূর মনে পড়ে—দানবীর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর টাকায় এবং বরদা মজুমদারের সম্পাদনায় এই 'শিশু' মাসিকটি প্রকাশিত হত।

শিশু মাসিক যেদিন গ্রামে এসে পৌঁছুতো ছেলেদের মহলে সেদিন হুল্লোড় পড়ে যেত। কারো পড়াশোনার দিকে মন থাক্‌ত না, বিকেল বেলা খেলার মাঠ শূন্য পড়ে থাক্‌ত। আমরা সড়কের এক মাথায় সবাই গোল হয়ে বসতাম। একজনে পড়ত, আর সবাই মিলে শুন্‌তাম।

ধাঁধার জবাব দেয়াটা ছিল সব চাইতে মজার ব্যাপার! কে আগে ধাঁধার উত্তর দিতে পারে সেইজন্যে ছোট্ট "শিশুটি" নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।

ছোট্ট বইখানি দেখে-দেখে যেন আর আশ্‌ মেটে না! ওর ছবি, গল্প, পৌরাণিক কাহিনী, ছোট ছোট ছড়া আর কবিতা, জীবনী, সব কিছুই আমাদের মন টেনে নিত! যারা যারা ধাঁধার উত্তর দিয়েছে—তাদের নাম ছাপা হত কাগজের শেষের দিকে। নিজেদের নাম ছাপার হরফে বেরিয়েছে কিনা দেখ্‌বার জন্যে অনেকগুলি মাথা একসঙ্গে হুম্‌ড়ি

খেয়ে পড়ত।' শিশু' পড়ে পড়ে আমাদেরও সখ হল—একটা কাগজ বের করি। কেন-না ঐ কাগজ নিয়মিত আস্‌ত না। সেইজন্যে আমাদের আক্ষেপের অবধি ছিল না।

আমাদের নিজেদের কাগজে আমরা নিজেরাই গল্প লিখ্‌বো, ছবি আঁকবো, কবিতা রচনা করবো, শেষকালে নিজেরাই বাঁধাই করে নেবো খাতাখানি।

যে-কথা সেই কাজ। সবাই মিলে লেগে পড়লাম—পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যাপারে। প্রথমে আমরা যে যার লেখা লিখে ফেল্লাম। কবিতাই বেশী। কেন-না—ছেলে বয়সে সবাই কবি হতে চায়। গল্প ও ভ্রমণ কাহিনীও ছিল কিছু কিছু। আর ছিল ধাঁধা। "তিন অক্ষরে নাম মোর সর্ব্বলোকে জানে"—এই জাতীয় ধাঁধা যে কত এসেছিল তার ঠিক নেই।

জড়ো করা সব রচনা থেকে বাছাই করে নিতে হল—লেখাগুলি। যার হাতের লেখা ভালো সেই নকল করবে—সকলের লেখা।

ভালো হাতের লেখার কথায় মনে পড়ছে আমাদের মাষ্টার মশাই—রামগোবিন্দ অধিকারীকে! তাঁর হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল। তিনি আমাদের অনেক যত্ন নিয়ে হাতের লেখা লেখাতেন। তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েই—ছেলেবেলায় আমার হস্তাক্ষর বেশ গোটা-গোটা হয়ে উঠেছিল। এই ব্যাপারে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। "একেবারে ছাপার অক্ষরের মত লিখতে হবে"—এই ছিল্ তার মুখের কথা।

আমাদের তীর্থবাসী পণ্ডিত মশায়ের হাতের লেখাও খুব ভালো ছিল। তিনি খাতার ওপর এক লাইন লিখে দিতেন আর বল্‌তেন—এই কথাটাই প্রতি লাইনে লিখে যাও। তিনি প্রায়ই লিখে দিতেন—"আমি হাসি ভালবাসি", অথবা "দীন দেখিয়া দান করিবে" কিম্বা "অজীর্ণ ভোজনং নিষেধং।" ওই সব কথাগুলি আমরা খাতা ভর্ত্তি করে লিখ্‌তাম।

অবশেষে আমাদের হাতে লেখা পত্রিকা একদিন প্রকাশিত হল। পণ্ডিতমশাই তার পাতা উল্টে কয়েকটি কবিতা পড়ে বল্‌লেন,

হুঁ! সব মহাকবি মাইকেল হয়ে উঠ্‌বে দেখ্‌তে পাচ্ছি। হ্যাঁরে তোরা অন্য বই থেকে নকল করে কিছু লিখিস নি ত'?

এই কথা শুনে আমরা মনে-মনে ভারী চটে গিয়েছিলাম।

অবশ্য কিছুদিন চল্‌বার পর—আমাদের উৎসাহে ভাটি পড়ে এসেছিল। তারপর কাগজখানা আপনিই উঠে গিয়েছিল। কিন্তু সেই কাগজের ভেতর দিয়েই আমাদের সাহিত্য-চর্চ্চার প্রথম সূত্রপাত। সে-দিক দিয়ে তার প্রকাশ নিষ্ফল হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে—

"যে-ফুল না ফুটিতে—
লুটেছে ধরণীতে—
যে-নদী মরুপথে হারালো ধারা—
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা॥"

একটু যখন বড় হয়ে উঠেছি—মামা আমাদের "চাণক্য-শ্লোক" মুখস্থ করাতেন—

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচনঃ
স্বদেশে পূজতে রাজাঃ, বিদ্বানঃ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।

তখন এইসব শ্লোক মুখস্ত করতে এত খারাপ লাগতো যে কি বলবো! ভাব্‌তাম,—এই সব অং বং খং মুখস্ত ক'রে কি হবে? তার চাইতে হুটো গল্পের বই পেলে বেঁচে যেতাম। কিন্তু গ্রাম-দেশে গল্পের বই কোথায় মিল্‌বে? পড়ার রাজ্যে সেকালে আমরা নিত্য-হুর্ভিক্ষে ভুগ্‌তাম!

কিন্তু "চাণক্য-শ্লোক" মুখস্ত করার ব্যাপারে অমনোযোগী হলে চল্‌ত না। রোজ একটি করে শ্লোক মুখস্ত করে আমাদের শোনাতে হত। সেই সঙ্গে তার বাঙ্‌লা কবিতাও—

"বিদ্যা আর রাজপদ এ হুই বিষয়—
কখনই এ জগতে তুল্য-মূল্য নয়

কেবল আপন দেশে রাজা পূজা পায়
বিদ্বান পূজিত হয় সমগ্র ধরায় ॥”

মুন্সীবাড়ীর মেজ তরফে যে আমাদের পিশেমশাই ছিলেন—তিনি হচ্ছেন ঘর-জামাই। এই তরফের পিশিমাকে আমরা “আম্-পিশিমা” বলে ডাক্‌তাম। এই ঘর-জামাই পিশেমশায়ের নাম রামগোপাল সেন।

এই পিশেমশাই এম্‌নি সাধারণ ভাবে খুব ভালো ছিলেন। কত সময় আমাদের ডেকে গল্প করতেন, আদর করতেন। আবার এক-এক সময় দেখ্‌তাম—বাইরের বৈঠকখানা ঘরে গুম্ হয়ে বসে আছেন। তখন কেউ তার কাছে যেতে সাহস পেতেন না। লোকে কাণাকাণি করত ওরা নাকি পাগলের গুষ্টি। অন্য তরফের সরিকদের সঙ্গে এই পিশেমশায়ের মোটেই বন্‌ত না। তাই তাঁর সঙ্গে সবাইকার মাম্‌লা-মোকদ্দমা লেগেই থাক্‌তো।

আমি যখন মাঝে-মাঝে মামাবাড়ী থেকে বেড়াতে আস্‌তাম—তিনি আমায় আদর করে কাছে ডেকে নিতেন, অনেক গল্প করতেন আমার সঙ্গে। এই ছোট ছেলেটির সঙ্গে তাঁর যেন একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাই এই পিশেমশায়ের কেউ নিন্দে করলে আমার কিন্তু ভালো লাগতো না। দিব্যি ত’ মানুষ, আমার সঙ্গে কত ভাব লোকে মিছি-মিছি ওঁর নিন্দে করে কেন আমি বুঝ্‌তে পারতাম না!

পিশেমশায়ের ছেলেদের মধ্যে হেমদা আর বুড়ুদার সঙ্গেই আমার বিশেষ ভাব ছিল। এঁরা দু-জনে বাপের এই গুণটা পেয়েছিলেন, ছোটদের সঙ্গে মিশ্‌তে আর গল্প করতে খুব ভালো বাস্‌তেন।

প্রতিদিন বিকেলবেলা বুড়ুদা নহবৎ-খানায় ছোটদের খেলার সময় তাদের খুব উৎসাহিত করতেন। এক-একদিন দেখ্‌তাম, বুড়ুদা খুব গম্ভীরভাবে চুপচাপ বসে আছেন করো সঙ্গে কোন কথা বল্‌ছেন না। ছেলেরা খেলার কথা জিজ্ঞেস্ করতে এলেও কোন সাড়া-শব্দ নেই! দেখে আমরা সত্যি অবাক হয়ে যেতাম!

এক-একদিন মানুষটার কি হয়?

আপন মনে অনেক বই পড়তেন বুড়ুদা। আর তার বড় ভাই হেমদা ছোটদের মুখে মুখে অঙ্ক শেখাতেন। মজার মজার গল্প করতেও তিনি ওস্তাদ ছিলেন।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল, বুড়ুদা কাউকে কিছু না বলে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছেন।

এই কথাটা শুনে আমাদের ভারী আশ্চর্য্য লেগেছিল। এমন সুন্দর মানুষটি! ছেলেদের সঙ্গে মিশ্‌তে, গল্প বল্‌তে, খেলা-ধূলা করতে তার জুড়ি মেলা ভার। এমন কি কাণ্ড ঘট্‌লো যার জন্যে তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ বাড়ী থেকে চলেই গেলেন?

এই ঘটনা নিয়ে গ্রামে খুব আলোড়ন হয়েছিল।

আমরা ছোটরাও অনেক সময় নিজেদের মধ্যে বসে আলোচনা করতাম, কেন বুড়ুদা কাউকে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে গেল!

হেমদা—বুড়ুদাদের বোন সোটনদিও পাগলা হয়ে গিয়েছিলেন! সোটনদির আঁচল ধূলোয় লুটিয়ে পড়েছে, আর তিনি সারা বাড়ী পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন—এই ছবিটি এখনো চোখের ওপর ভেসে ওঠে।

একদিন সোটনদি হাতে করে মোহনভোগ নিয়ে এলেন। আমাকে সাম্‌নে দেখ্‌তে পেয়ে বল্‌লেন, খাবি?

আমি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালাম।

নীচের দালানের পাশে—রাঙা তরফের আর একটি কামরা সব-সময় তালাবন্ধ থাক্‌ত। সোটনদি হাতের সেই মোহনভোগ দলা পাকিয়ে বন্ধ ঘরের তালার ওপর বসিয়ে রেখে আপন মনে বক্‌তে বক্‌তে একদিকে চলে গেলেন! এই ঘটনাটা এখনো যেন চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাই। ছোটবেলায় পাগলদের ভয়ানক ভয় পেতাম।

মামাবাড়ীতে আর একটি পাগলী-মেয়েছেলে আস্‌ত। সে খোনা গলায় এমন বিশ্রীভাবে কথা বল্‌ত যে, তার সাড়া পেলেই আমি ঘরের ভেতর গিয়ে লুকোতাম।

কিছুদিন বাদে শুন্‌লাম, হেমদাও পাগল হয়ে গেছেন। তাকে ঘরের ভেতর শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। মানুষ যে কেন

পাগল হয় আমরা বুঝে উঠতে পারতাম না। ভয়ে ভয়ে জান্‌লার ফাঁক দিয়ে তাঁকে দেখতাম। চুপচাপ বসে আছেন হেমদা। এই মানুষটিকে ভয় করবার কি আছে আন্দাজ করবার চেষ্টা করতাম।

রাঙা তরফের খুকী—নাম তার কিরণ,—আমার চাইতে বয়েসে কিছু ছোট। মামাবাড়ী থেকে যখন মুন্সী বাড়ী আস্‌তাম—তখন সে হত আমার খেলার সাথী। কিরণ খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে ছিল, কারো সঙ্গে ওর ঝগড়া হত না। কাজেই খেলাও বেশ জমে উঠত। পুতুলের কাপড় পরাতে, পুতুল সাজাতে ও ছিল ওস্তাদ। ওর সঙ্গে নতুন করে আমরা খেলাঘর সাজিয়েছিলাম।

তারপর আরো যখন বড় হয়েছি—হঠাৎ একদিন শুন্‌লাম আমাদের সন্তোষের বন্ধু উপেনের ছোড়দিদির সঙ্গে কিরণ সই পাতাচ্ছে। খুব খরচ-পত্র করে সই-পাতানো উৎসব হল।

এই উপলক্ষে উপেনের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বও আরো গাঢ় হয়ে উঠল। উপেন খুব সুন্দর মাটির মূর্ত্তি তৈরী করতে পারতো। চমৎকার ছবি আঁক্‌তেও পারত। তার ছবি আঁকা দেখে আমরা সবাই অবাক হয়ে যেতাম।

আমাদের ছেলেবেলায় মেয়েদের মধ্যে এই রকম সই-পাতানোর প্রথা প্রচলিত ছিল। 'গঙ্গাজল,' 'বেলফুল,' 'দেখন হাসি' এইসব নাম ধরে সইরা পরস্পরকে ডাক্‌তো। কিরণের সঙ্গে উপেনের ছোড়দির যখন সই পাতানো হল সেই সময় গ্রামে খুব সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সন্তোষ আর সাকরাইল পাশাপাশি গ্রাম। দুই পরিবারের মধ্যে খুব যাতায়াত ছিল। উপেনের ছোড়দি দেখ্‌তে খুব সুন্দরী ছিল। এই সই পাতানোর পর ওরা ভাই-বোনে প্রায়ই মুন্সীবাড়ীতে আস্‌ত।

সন্তোষ আর সাকরাইলের মাঝামাঝি জায়গায় উপেনের ঠাকুর্দ্দার একটা সমাধি মন্দির ছিল। আমাদের গ্রাম থেকেই সেই মন্দির দেখা যেত। লোকে বল্‌ত ঈশান ঘোষের মঠ। ছেলেরা কিন্তু সে সময়

সেই মঠের পাশ দিয়ে যেতে ভয় পেতো। জনশ্রুতি ছিল যে, গভীর রাত্রে ঐখানে অনেকে সাদা কাপড় পরা কাকে নাকি দেখেছে!

সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে এই মঠ সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত ছিল আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

এইবার আমাদের গ্রামের ইস্কুলের কিছু গল্প শোনাবো। আমি যখন এখানে ভর্ত্তী হলাম সেই সময় সাকরাইল ইস্কুলের পড়াশোনার ব্যাপারে বেশ সুনাম ছিল।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিজয় গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রখর দৃষ্টি ছিল নিয়ম শৃঙ্খলা ও পড়াশোনা পরিচালনার দিকে। আর তীর্থবাসী পণ্ডিত মশাই ত' ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাণ। প্রকৃতপক্ষে রাত্তিরে কয়েকঘণ্টা ঘুমুনো ছাড়া তিনি সকাল থেকে সুরু করে সব সময় এই বিদ্যালয়ের কথাই চিন্তা করতেন। এই ছোট্ট শিক্ষায়তনটিকে বাঁচিয়ে রাখা যেন তার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল।

উত্তর ও দক্ষিণে লম্বা ইস্কুলটি। তার ভেতর কয়েকটি টিনের ঘর। কাঁচা মাটির ভিটে। শুধু যে গ্রামের ছেলেরাই এখানে পড়ত তা নয়, আশেপাশের দূর অঞ্চল থেকেও ছেলেরা এখানে ভর্ত্তি হত। মাইনে ছিল খুব কম। তাও আবার আদায় হত না। প্রতি পূজোর সময় গ্রামের বাসিন্দারা বাড়ী ফিরতেন—তখন ইস্কুল ছুটি হয়ে যেত। অন্যান্য শিক্ষকরা নিজের নিজের বাড়ী চলে যেতেন, কিন্তু পণ্ডিত মশাই ছুটিতেও দেশে যেতেন না। এই সময়েই তাঁর সব চাইতে বেশী কাজ। কেন না, বাড়ী বাড়ী ঘুরে গৃহস্বামীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতে হবে। যেন পণ্ডিত মশায়েরই পিতৃদায়। যাঁদের গ্রামের বিদ্যালয় তাঁরা পাশ কাটিয়ে থাক্‌তে চান। পণ্ডিত মশাইকে বাড়ীর সীমানার মধ্যে আস্‌তে দেখ্‌লেই মুখ বিরক্তিতে ভরে যায়।

পণ্ডিত মশাই কিন্তু নির্ব্বিকার!

"বকো আর ঝকো কানে দিয়েছি তুলো—
মারো আর ধরো পিঠে বেঁধেছি কূলো॥"

চাঁদা দাও—বাপের সুপুত্তুর হয়ে চলে যাচ্ছি। নইলে এই গ্যাঁট হয়ে বসে রইলাম বৈঠকখানায়।

আজকালকার দিনে যে অবস্থান ধর্ম্মঘটের কথা শোনা যায়—এটা বহুপূর্ব্বেই প্রবর্ত্তন করেছিলেন—সাকরাইল গ্রামে এই তীর্থবাসী পণ্ডিতমশাই। সেটা তখন আমরা কেউ বুঝতে পারতাম না, কিন্তু এখন জগতের হাল-চাল দেখে বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়েছে।

গাঙ্গুলী মশাইকে ডাকতাম আমরা গাঙ্গুলী আজামশাই বলে। কিন্তু ইস্কুলে আর বাড়ীতে তাঁর দুইরূপ। বিদ্যালয়ে তিনি দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ প্রধান শিক্ষক। কিন্তু বাড়ীতে ঢুকলেই একেবারে মাটির মানুষ। তিনি আমাদের সঙ্গে মজা করাবার জন্যে নানারকম খাবার নিজের বাড়ীর ভেতর হাড়ি-কুঁড়িতে, মাচার ওপর, কুলুঙ্গীতে, খাটের তলায় আর চালের জালার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিতেন। নিজে কিচ্ছু বল্‌বেন না—কোথায় কি লুকোনো আছে! খুঁজে বের করে খেতে পারলে তিনি ভারী খুশী হতেন।

খাটের ওপর বসে খবরের কাগজ পড়তেন, আর মিটিমিটি হাস্‌তেন। মাঝে মাঝে আড় চোখে তাকিয়ে দেখতেন আমরা যথাস্থানে অনুসন্ধান-কাজ চালাতে পারছি কিনা! সত্যি কথা বল্‌তে কি,—তাঁর বাড়ীতে গিয়ে প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা চালাতে হত!

এইভাবে কোনো জায়গা থেকে বেরুতো পাকাকলা, কোথা থেকে উঁকি মারত কদমা, কোথায়ও গা ঢাকা দিয়ে থাকতো মুড়ির মোয়া, কোথায় বা স্বদেশী ডাকাতের মতো আত্মগোপন করে থাক্‌তো পাটালী গুড়!

এক একটি জিনিসের আবিষ্কার হত—আর তিনি বালকের মতো হো-হো করে হেসে উঠ্‌তেন। এই ছিল সেই বুড়ো মানুষটির খেলা!

কিন্তু বিদ্যালয়ে গিয়ে তাঁর আর একরূপ। চেহারা দেখে বোঝবার যো নেই যে, তিনি আমাদের চেনেন। এমন রাশভারী আর গম্ভীর। ইস্কুলের নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে তিনি ভারী চটে যেতেন।

একদিনের ঘটনার কথা বেশ মনে আছে। তখন ক্লাশ চল্‌ছে। আমরা কয়েকটি ছেলে দল বেঁধে পাশের পোষ্টাপিসের অন্দর মহলে ঢুকেছি জল খাবার জন্যে। ইস্কুলে খাবার জলের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু পাশেই পোষ্ট মাষ্টারের অন্দর মহলে ছিল কুয়ো। সুযোগ পেলেই আমরা ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গিয়ে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট করে জল খেয়ে আস্‌তাম। একদিন সেই রকম গিয়েছি জল খেতে। তেষ্টা পাওয়াটা উপলক্ষ মাত্র। আসলে পোষ্ট মাষ্টারের অন্দরে আছে কুলগাছ। তারই তলায় আমাদের যত আনাগোনা। অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে যখন ইস্কুলে ফিরে আস্‌ছি—হঠাৎ আমাদের পিঠের ওপর আচম্‌কা ভাদ্র মাসের তাল পড়তে লাগ্‌লো। পেছনে তাকিয়ে দেখি—স্বয়ং হেড্‌ মাষ্টার মশাই!

তখন একেবারে দে ছুট—দে ছুট!

এই গাঙ্গুলী মশাই যখন আবার ইস্কুল ছেড়ে দিলেন—তখন দেখতাম দুপুর বেলা তিনি সন্তোষ থেকে বাজার করে ছোট্ট ডিঙি নৌকোতে বাড়ী ফিরছেন। আমাদের ইস্কুলের সাম্‌নে দিয়েই খাল। যাবার সময় হয়ত হাত উঁচু করে এক কাঁদি সবরী কলা দেখিয়ে গেলেন। ইঙ্গিতটা হচ্ছে ছুটির পর আমার বাড়ী এসো—তারপর খুঁজে বের করো—কোথায় সেই কলার কাঁদি।

এম্‌নি মজার মানুষ ছিলেন তিনি। আজও চোখ বুঁজে খানিকক্ষণ থাকলে তার হাসিমুখ দেখতে পারি আর কানে শুন্‌তে পারি সেই দিল-খোলা হাসির শব্দ।

সাকরাইল বিদ্যালয়কে ঘিরে আমাদের যে সুন্দর জীবন গড়ে উঠছিল তার ভেতর সহপাঠীদের প্রীতিও বড় কমখানি জড়িয়ে ছিল না। সুরেশ রায় আর মুইচ্যা বলে যে দুটি ছেলে কায়স্থপাড়া থেকে আস্‌ত—তাদের সঙ্গে আমরা বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। সুরেশ কিছুকাল আমাদের ক্লাশে প্রথম স্থাম অধিকার করত, আর আমি হতাম দ্বিতীয়। এই নিয়ে আমাদের বন্ধুত্বও যেমন ছিল, রেষারেষিও বড় কম হত না। সুরেশের বাবা দিনাজপুরে আমার বড়মামার কাছে কাজ করত।

আমরা সবাই তাকে ডাকতাম মাণিকদা বলে। এই মাণিকদা সব-সময় ছোটদের আব্দার হাসিমুখে সহ্য করত।

সুরেশদের বাড়ীতে কয়েকটি ভালো আম গাছ ছিল। সেই আমগুলো ছিল ভারী মিষ্টি। সারা গাঁয়ের লোক বল্‌ত, মাণিকের বাড়ীর মিষ্টি আম। সুরেশ বছরে একদিন নির্ব্বাচিত কয়েকজন বন্ধুকে এই মিষ্টি আম খেতে নেমন্তন্ন করত। এই দিনটি যে আমাদের কী আনন্দে কাট্‌ত তা' বলে বোঝাতে পারবো না। বড় বড় পাথরের বাটি—তার নাম ছিল খাদা। সেই খাদা ভর্ত্তি ঘন ক্ষীর তৈরী হয়ে থাক্‌তো আমাদের জন্যে। আম কেটে সাজিয়ে দিত থালায় থালায়। হাঁড়ি থেকে বেরুতো মুড়কি। এই মুড়কির গ্রাম্য নাম ছিল 'উফ্‌রা'। তার সঙ্গে এসে জুটত পাকা কলা। সুতরাং ফলারটা যে কেমন হত—সেকথা খুব সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। সুরেশদের বাড়ী এই আম খাওয়া ইস্কুলের অন্যান্য ছেলেরা খুব ঈর্ষার চোখে দেখত। ভাবত, আমরা যদি সুরেশের সঙ্গে পড়তাম—তাহলে কি মজাই না হত!

যোগেশ চন্দকেও ভুল্‌তে পারিনি। ও আস্‌ত আমাদের পাশের গ্রাম বিন্নাকৈর থেকে। দেখ্‌তে খুব ফর্সা ছিল, আর ওই অল্প বয়েসেই তার গোঁফের রেখা দেখা গিয়েছিল।

আমরা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করতাম, যোগেশ, তোর গোঁফ উঠ্‌ল কি করে? যোগেশ একদিন পকেটে করে একটি ছোট্ট শিশি নিয়ে এলো। তাতে কি তেল রয়েছে। বল্লে, এই তেল রোজ গোঁফে মালিশ করলে দিব্যি গোঁফ গজিয়ে যাবে। ওর দেখাদেখি আমরাও গোঁফে তেল মাখিয়ে নিলাম। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা গোঁফ আর গজালো না

আমাদের বিদ্যালয়ের একদিকে একটা বিরাট বটগাছ, আর এক কোণে কৃষ্ণচূড়া গাছ। দুটো গাছই আমাদের খুব প্রিয় ছিল। অনেক সময় আমরা ছুরি দিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছে নিজেদের নাম খোদাই করে রাখতাম।

ইস্কুলের বেড়া ছিল বাঁশের। আমরা সেই বেড়া ফুটো করে, দড়ি বেঁধে—এক একটা তাকের মতো তৈরী করেছিলাম, তাতে নিজের নিজের বই ঝুলিয়ে রাখতাম। কার তৈরী তাক সব চাইতে ভালো হয়েছে—এই নিয়ে আমাদের খুব যেশারেষি হত।

ইস্কুলে অন্যান্য বিষয় পড়তে আমার বেশ ভালই লাগ্ত, কিন্তু যেই অঙ্কের ক্লাশ সুরু হত—অম্‌নি যেন গায়ে জ্বর আস্ত।

ছায়েদ আলি বলে যে মুসলমান ছেলেটি আমাদের সঙ্গে পড়ত, সে পড়া-শুনায় খুব ভালো ছিল। আমি অঙ্কে কোনো রস পেতাম না, কিন্তু সে অঙ্কও খুব ভালো জান্‌তো। অনেক সময় ছায়েদ আলিও আমাদের ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করত। আর একটি বিষয়ে ছায়েদ আলির সঙ্গে আমার খুব মিল ছিল। আমাদের ছু-জনেরই ছিল ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক। আমরা অবসর সময়ে নানা জিনিস আঁকতাম। ছায়েদ আলি ত' তখন বেশ ভালই ছবি আঁকতে পারত। বড় হয়ে আমরা যখন গ্রামে নানা নাটক অভিনয় করতাম—ছায়েদ আলি তখন 'আর্ট ডিরেক্টরের' দায়িত্ব গ্রহণ করত। আমাদের খুব ছোট বয়সে সুরেশদা যে কাজে এগিয়ে আসতেন—ছায়েদ ঠিক সেই কাজগুলি আমাদের দলের হয়ে আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করত। অবশ্য সুরেশদার মতো অতখানি যোগ্যতা তার ছিল না, কিন্তু নিষ্ঠা ছিল তার ষোল আনা।

এই সময় আমি তীর্থবাসী পণ্ডিত মশায়ের কাছে আমার এক ভাগ্নে মুকুলদের বৈঠকখানা ঘরে সকাল-সন্ধ্যায় গিয়ে পড়ে আস্তাম। সেই ঘরেই পণ্ডিত মশাই রাত্রে থাক্‌তেন। আমরা চারজনে তখন একসঙ্গে পড়তাম। আমি, মুকুল, আর আমাদের আর ছুই ভাগ্নি বুলি আর রুলি। সকালবেলা উঠেই আমাদের কাজ ছিল বাগান থেকে ফুল তোলা। এই কাজে পণ্ডিত মশাই খুব উৎসাহ দিতেন।

যে-দিন বুলি কিম্বা রুলি আমাদের চাইতে বেশী ফুল তুল্‌তো

সে-দিন আমরা ভারী চটে যেতাম। অনেক সময় রাগের মাথায় ওদের তোলা ফুল কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিতাম। ওরা চটে-মটে পণ্ডিত মশায়ের কাছে নালিশ করত। বকুনি যে আমাদের না খেতে হত তা' নয়।

এই সময় আমরা আর একটি বিষয় শিখে ছিলাম। সেটি হচ্ছে ডায়েরী রাখা। সারাদিন ধরে আমরা কি করেছি—রাত্তিরে শোবার সময় ডায়েরী লিখে রাখ্‌তে হত। আর সে ডায়েরী লিখ্‌তে হত ইংরেজীতে। বেশ মনে আছে ডায়েরীতে প্রথম কথাটা লিখ্‌তাম—I plucked flowers in the morning তারপর যে কি লিখ্‌তাম আজ আর তা' মনে করতে পারছি না।

জীবনে প্রথমে যে বরযাত্রী গিয়েছিলাম—তার মজাদার অভিজ্ঞতার কথা আজও ভুল্‌তে পারিনি। আমি যে শুধু বর যাত্রীদেরই একজন ছিলাম—তা নয়, এক্ষেত্রে আমার আলাদা একটা পরিচয়ও ছিল। আমি ছিলাম নিত্‌বর। কাজেই আনন্দে নেচে ওঠবারই কথা।

আসল কথাটাই কিন্তু এখনো বলা হয়নি। আমার মেজদার বিয়ে। মেজদা আমাদের জ্যাঠ্‌তুতো ভাই। কিন্তু চিরকাল আপন ভাই বলেই মনে করেছি, আবদারও চল্‌তো ঠিক সেই ভাবেই।

মেজদার দলটি নেহাৎ কম নয়। ছেলেবেলায় মেজদা খুব ভালো ফুটবল খেল্‌তে পারতেন। তা-ছাড়া অভিনয়েও তাঁর দক্ষতা ছিল। এহেন মেজদার বিয়ে—লাফাবো না ত' কি? একবার বার-বাড়ী, আর একবার ভেতর-বাড়ী লাফা-লাফি করে ফিরতে লাগলাম।

মেজদার আরো একটি গুণ ছিল। চমৎকার কবিতা লিখতে পারতেন। তাঁর হাতের লেখাটিও ছিল একেবারে মুক্তোর মত।

একদিন চুপি চুপি মেজদা আমাকে ডাক্‌লেন। তারপর যে-কথা তিনি আমায় জানালেন—তাতে ত' আমি একেবারে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে উঠে গেলাম।

মেজদা বল্‌লেন, ছ্যাখ্‌, বিয়ের একটা কবিতা লিখেছি। তোর

নামেই ছাপ্‌বো। কাউকে বলিস্ নি যেন! আমি হাস্‌বো কি কাঁদ্‌বো প্রথমে বুঝতে পারিনি! আমার নামে কবিতা ছাপা হবে?

এ-যে ভালো করে বিশ্বাস করতেই পারছি নে! ছাপার অক্ষরে বেরুবে আমার নাম?—আর সবাই তা দেখবে?

ছাপার অক্ষরে এই প্রথম আমার নাম বেরুচ্ছে। যদিও তার লেখক আমি নিজে নই—তবু আনন্দটা কি কিছু কম? যাকে সাম্‌নে পাচ্ছি তাকেই বলে বেড়াচ্ছি।

—জানিস্, মেজদার বিয়েতে আমার কবিতা ছাপা হচ্ছে? বন্ধুরা ঈর্ষান্বিত হয়, আর বড়রা মুখ টিপে হাসে।

অবশেষে লাল কালিতে সত্যি একদিন ছাপা হল সেই কবিতা। গোলাপী কাগজের ওপর লাল ছাপা। যতদূর মনে আছে—টাঙ্গাইলের প্রেস থেকে সেই কবিতাটি ছাপা হয়েছিল।

গ্রামে একেবারে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। প্রত্যেক বাড়ীতেই মেজদার বন্ধু আছে। তারা ত' কোমর বেঁধেছেন সকলের আগে। এই দলের গোদা হচ্ছেন—আমাদের যতুকাকা। তিনি হলেন দলের ক্যাপ্টেন। সবাইকে কি রকম বিছানা সঙ্গে নিতে হবে, সুটকেশের আকার কত বড় হবে, ধোয়া কাপড়-জামা কখানা করে নিতে হবে—এই সব ব্যাপারে সবাইকে তিনি উপদেশ দিতে লাগলেন। আর উৎসাহ দেখা গেল কাশীনাথদার। কাশীনাথদা আমাদের জ্ঞাতিভাই। মুন্সীবাড়ীর পুকুরের পশ্চিম অঞ্চলে তাঁদের বাড়ী। এই কাশীনাথদা খুব আমুদে লোক ছিলেন, প্রচুর খেতে পারতেন আর দেখ্‌তেও বেশ মোটা-সোটা মানুষ ছিলেন। তিনি ভূঁড়িতে হাত বুলিয়ে কেবলি বলে বেড়াতে লাগলেন, কেষ্টর বিয়েতে বরযাত্রীর খাওয়ায় একটা খেল্ দেখিয়ে দিতে হবে। হরিপদবাবু পাত্‌লা মানুষ। খাওয়ার দিকে তাঁর বিশেষ নজর নেই, কল্‌কাতায় পড়াশোনা করেন, আর ছুটিতে দেশে আসেন। থিয়েটার করার দিকে তাঁর ভারী ঝোঁক। হরিপদ বাবুর ইচ্ছে কেষ্টর বিয়েতে একটা জম্-জমাট নাটক হোক্।

অন্যান্য বন্ধুদের দৃষ্টি বরযাত্রীর খাওয়া-দাওয়ার দিকে। কি

জাতীয় ভোজ কণের-বাড়ী জুটবে—তাই নিয়েই আলোচনা চল্‌তে থাক্‌লো। ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ অঞ্চলের গোবিন্দপুর গ্রামে বিয়ে ঠিক হয়েছে। আমার মেজ বৌদি আস্‌ছেন সেই গ্রাম থেকে।

এই জীবনে প্রথম বরযাত্র যাচ্ছি—তাই কল্পনার দৌড়টাও একটু বেশী। মেজ-বৌদি দেখতে কেমন হবে, আমার সঙ্গে ভাব হবে—না আড়ি হবে—নানা কথাই তখন মগজে বাসা বেঁধেছিল।

এই বিয়ে উপলক্ষে দীনেশ এসে হাজির দিনাজপুর থেকে। দীনেশ মেজদার মামাত' ভাই—আর আমাদের সমবয়েসী বন্ধু। গ্রামে আমাদের উত্তরের দিকের বাড়ী হচ্ছে দীনেশদের। কিন্তু তখন ওরা দেশে থাক্‌তো না। দিনাজপুরের বাড়ীতে থেকেই পড়াশোনা করত। দীনেশ সেনেদের বাড়ীর ছেলে। ওদের বাড়ীর বিরাট পুকুরে আমরা সবাই একসঙ্গে স্নান করতাম। সে স্নানের আনন্দ ছিল আলদা।

দীনেশ ছেলেবেলায় আরো রোগা-পটকা ছিল। মজার মজার টিপ্পনি কাটতে আর নৌকো করে বেড়াবার সময় খালি গলায় বেশ গান গাইতে পারত। ওর টিপ্পনীর জন্যে মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গে ঝগড়া লেগে যেতো। সেই কথা কাটা-কাটি থেকে মারামারি পর্যন্ত চল্‌ত। কিন্তু গায়ের জোরে দীনেশ আমার সঙ্গে এঁটে উঠ্‌ত না। ফলে ওই মার খেত বেশী!

একদিন মেজদা আমায় আড়ালে ডেকে বল্‌লেন, দীনেশ ত' আমাদের বাড়ীর অতিথি। তোর সঙ্গে ওর যদি খালি ঝগড়া মারা-মারি হয়—তবে ও বিয়েতে যাবে কি করে? আমি তাহলে ওকে দিনাজপুর ফিরে যেতে বলি?

সেই থেকে দীনেশের সঙ্গে আর আমার ঝগড়া লাগে নি।

বিয়ের দিন এগিয়ে এলো।

গাঁয়ের রজকদল বরযাত্রীদের তাগিদে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

খুব ফর্সা করে জামা-কাপড় কেঁচে দিতে হবে। নইলে কন্যা-পক্ষের লোকদের তাক্‌ লাগিয়ে দেয়া যাবে কি করে?

তখনকার দিনে কন্যা-পক্ষকে নানাভাবে কি করে ঘায়েল করা যায় এই ছিল বরযাত্রীদের আলোচনার বস্তু।

তখন অবশ্য চায়ের প্রচলন হয় নি। কিন্তু আমরা আমাদের গ্রামে দেখেছি বরযাত্রী দল এলেই সকলে সশঙ্কিত চিত্তে থাকৃত। বরযাত্রীরা কখনো সরবৎ চাইছে, কখনো ডাবের জলের ফরমাস দিচ্ছে, কখনো ঘোলের সরবৎ দাবী করে বসছে! একবার হয়েছিল কি রাত বারোটার সময় বরযাত্রী দল বলে বস্‌ল, লেমনেড খাবো—

তখন ছোট্ সাইকেল নিয়ে টাঙ্গাইল!

আমাদের গ্রামের যুবকবৃন্দ ছেলেবেলা থেকেই এই সব তাণ্ডব দেখেছে। তাই তাদের ধারণা হয়ে গেছে—যে, কন্যাপক্ষের বাড়ী গিয়ে নানাভাবে তাদের বিব্রত করতে হবে।

যতুকাকা আবার এরই মধ্যে একটা ভাঙা হারমোনিয়াম নিয়ে গলা সাধতে বসে গেছেন। কি জানি,—বরযাত্রীদের যদি গান গাইতে বলে? কিছুতেই পেছু-হটা চল্‌বে না! আমরা হচ্ছি সাকরাইলের মানুষ—হুঁ!

যতুকাকা এই গানটি তৈরী করছিলেন—

"অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু, দেখি নাই আমি এমন তরণী বাওয়া!"

কে যেন হঠাৎ বলে বস্‌ল, মাথায় এই কাকের বাসা নিয়ে তোরা বরযাত্রী যাবি? ভালো করে চুল ছেঁটে নে!

তখন ডাক পড়ল গদা নাপিতের। গদা হচ্ছে এ অঞ্চলের সেরা নরসুন্দর। তাই তার চাহিদা বেশী। আর এ তল্লাটে সাকরাইলের বাবুরা হচ্ছেন সব চাইতে সৌখীন। সুতরাং গদা ছাড়া তাঁদের চলে না! এ ছাড়া পূজোতে-পার্ব্বণে, সঙ্কীর্ত্তনে গদা একেবারে এ গ্রামে অপরিহার্য্য। কাপড় কোঁচাতেও গদাধর অদ্বিতীয়।

এহেন গুণী মানুষটির ডাক পড়বে না ত' পড়বে কার?

রকমারী করে চুল ছাঁটাই হল বরযাত্রীদের। নতুন সাবান এলো টাঙ্গাইল থেকে। সেনবাড়ীর পুকুরে সে কি মুক্তিস্নানের ঘটা।

অবশেষে আমরা একদিন দৈয়ের ফোঁটা কপালে লাগিয়ে, মণ্ডপ, শিবমন্দির ও কালীবাড়ীতে মাথা ঠুকে—হুর্গা-হুর্গা বলে রওনা হলাম।

নহবৎখানা পর্য্যন্ত বাড়ীর মেয়েরা এসে আমাদের বিদায় দিলে।

ষ্টীমারে উঠে অভিনব কুশলতার সঙ্গে যতুকাকা কি ভাবে আমাদের জন্যে সতরঞ্জিগুলো বিছিয়ে নিয়ে যায়গা অধিকার করে বস্‌লেন—সেটা বড় বড় চোখ মেলে দেখলাম।

গোয়ালন্দ না কোন্ হোটেলে আমরা মাছের ঝোল ভাত খেয়ে নিয়েছিলাম ঠিক মনে নেই। তবে এই কথাটী মনে আছে যে, আমরা একদল হোটেলে খেতে গেলাম, আর একদল বিছানা ও জিনিসপত্র পাহারায় রইলেন। আমরা ফিরে এলে আবার সেই দল গেলেন খেতে।

দীনেশের সঙ্গে এখন ভারী ভাব হয়ে গেছে। সে আর আমি তখন বিছানায় শুয়ে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। যতক্ষণ ঘুম না এলো ষ্টীমারের ইঞ্জিনটা ক্রমাগত ধুক্-ধুক্ শব্দ করতে থাক্‌লো। সে রাত্তিরে সেই ধুক্-ধুক্ শব্দটা ভারী অদ্ভুত মনে হয়েছিল। ভাব্‌লাম, ওটা বুঝি ষ্টীমারেরই বুকের আওয়াজ!

অবশেষে গোবিন্দপুর গ্রামে পৌঁছে গেলাম।

কাশীনাথদা বল্লেন, ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে শেষটা হাজির হলাম আমরা! আমাদের বান্ধু-ঠাকুর্দ্দা এতখানি রাস্তার ধকলে ভারী কাবু হয়ে পড়লেন। ঠাকুর্দ্দার ছিল একটি কুঁজ। তাই নিয়ে তিনি হিম্‌সিম্!

বরযাত্রীদের জন্যে যে ঘরগুলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল—সেখানে চট্‌পট্ সব বিছানা পাতা হয়ে গেল। চ্যাটাইয়ের ওপর বিছানা পাতার ব্যবস্থা দেখে কাশীনাথ দা ভ্রূ কুঁচ্‌কে রইলেন।

প্রকৃতপক্ষে বরযাত্রীদের হুটি শিবির হয়ে গেল। একটি বুড়োদের, আর একটি যুবাদের।

বিপদে পড়লাম—আমি আর দীনেশ।

কোনো শিবির আমাদের যায়গা দিতে চায় না!

সেই চাম্‌চিকের দশা আর কি!

জন্তুরা বলে, ও ত' জানোয়ার নয় যে, আমাদের দলে থাক্‌বে?

আর পাখীরা আপত্তি করে জানায়, ও ত' পাখী নয় যে, আমাদের মধ্যে ঠাঁই পাবে? না পশুর দলে, না পাখীর দলে—

কাজেই চাম্‌চিকে যায় কোথায়?

কোনো গতিকে আমাদের ঠাঁই করে নিতেই হল।

কিন্তু রাত্তিরে ঘুমোয় কার সাধ্যি!

সাকরাইলের বাবুদের হাতের কাছে পেয়ে গোবিন্দপুরের মশার দল সমবেতভাবে আক্রমণ করল! আর মজা হচ্ছে এই যে, কেউ মশারী আনেনি!

যুব-শিবির বিদ্রোহ ঘোষণা করে সারারাত তাস্ খেল্‌তে সুরু করে দিলে।

যে পুকুরে আমাদের স্নান করতে হ'ত—সেখানে কোনো ঘাট্‌লা ছিল না। একটা গাছের শেকড় ধরে নানাকৌশলে জলে নাম্‌তে হত। মোটা মানুষ কাশীনাথ দা নাম্‌বার সময় কসরৎ দেখাতে গিয়ে একেবারে পা পিছলে আলুর দম!

তখন সকলের সমবেতভাবে সে কী হাসি!

মুখে কিছু না বল্লেও কাশীনাথদা মনে মনে ভারী চটে গেলেন। তারপর বরযাত্রীদের খাওয়া-দাওয়াও নাকি সাকরাইলের বাবুদের খুব মনোগত হয়নি।

কাশীনাথদার মনে কবিত্ব শক্তি জেগে উঠ্‌ল।

দারুণ আবেগে তিনি খাতা-পেন্সিল নিয়ে বস্‌লেন। রচনা করে বস্‌লেন একটি গান। সেই মজাদার গানের কয়েকটি লাইন এখনো মনে আছে—

আমরা সাধের বরযাত্রী!
নয়নে মোদের নাইকো ঘুম দিবস ত্রয়-রাত্রি!
শয্যা মোদের চাটাই শয্যা
আছে কিবা তাতে লজ্জা?
পানীয় মোদের পগাড়-পানি ময়লা যদিও অতি!

অতি উৎসাহে তিনি 'রাত্রির' সঙ্গে 'অতি'র মিল দিয়ে বস্‌লেন। তরুণ বরযাত্রী দল সারা রাত জেগে তারস্বরে সেই গান কোরাসে গেয়ে সবাইকে নিদ্রাবিহীন রাত জাগতে বাধ্য করলেন! গানটি ছিল অতি দীর্ঘ এবং তাতে বরযাত্রীদের দুর্দ্দশার কথা একেবারে যাকে বলে জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ ছিল। পরে গ্রামে ফিরে গিয়েও এই মজাদার গানটি লোকের মুখে-মুখে অনেকদিন চলেছিল! বরযাত্রীদের জন্যে আরো দুর্দ্দশা সঞ্চিত ছিল।

যেদিন আমরা রওনা হলাম—আমাদের সুটকেশ, বিছানা ইত্যাদি বহন করবার লোক জুটল না। খানিক দূর নৌকো করে পৌঁছুবার পর জানা গেল—ষ্টীমার এসে গেছে!

তখন যে যার মোট-ঘাট মাথায় নিয়ে, আর বোগল দাবা করে ছোট্-ছোট্-ছোট্!

ওদিকে ঘন-ঘন ষ্টীমারের ভোঁ শোনা যাচ্ছে। ষ্টীমার ফেল করলে আর দুর্দ্দশার অন্ত থাক্‌বে না!

এই মাল ঘাড়ে করে ছোটার ব্যাপারে আমাদের বান্ধু ঠাকুর্দ্দার কষ্ট হয়েছিল সব চাইতে বেশী। রোদে গলদ ঘর্ম্ম হয়ে, কুঁজের ভারে কাবু হয়ে—সুটকেশ হাতে তিনি যে ভাবে ছুটছিলেন তাতে তিনি কাফী খাঁ কিম্বা শৈল চক্রবর্ত্তীর কার্টুনের একটি ভালো মডেল হতে পারতেন।

আমাদের সঙ্গে তাঁর ঠাট্টার সম্পর্ক। ষ্টীমারে পৌঁছে পরে সবাই মিলে তাকে নানা রসিকতায় ছেঁকে ধরেছিল—এই কথাটা বেশ মনে আছে।

স্টীমারে উঠে আমার ওপর একটা প্রকাণ্ড দায়িত্ব এলো। সব সময় নতুন বৌয়ের খবরদারী করতে হবে আমাকে। স্নান করিয়ে আনানো, খাবার পোঁছে দেয়া, কখন কি দরকার—এইসব খবর নিতে গিয়ে মেজ বৌদির সঙ্গে ভারী ভাব জমে গেল।

আমরা দু'জনে প্রায় সমবয়সী ছিলাম। কাজেই গল্প জমে উঠতে এতটুকু বিলম্ব হল না। বড়দের মধ্যে কেউ কেউ আমায় শিখিয়ে দিলে, নতুন বৌকে গিয়ে বল—গরম গরম মুর্গির মাংসের ঝোল আর

ভাত খাবে নাকি ? আমার কাছে এই প্রস্তাব শুনে ত' মেজ-বৌদি তিড়িং-মিড়িং লাফাতে সুরু করল।

ইতিমধ্যে 'ছোট ঠাকুরপো' ডাক সুরু হয়ে গেছে।

আমাকে শাসিয়ে তিনি বল্লেন, আপনি যদি ওই সব অখাদ্য-কুখাদ্য খান তবে—আপনাকেও আমি ছোঁব না।

অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে হয়নি !

নতুন বৌয়ের সম্মানে—একটি সেকেণ্ড ক্লাশ কেবিনে আমাদের দুজনের ঠাঁই হল। আর সবাই যাচ্ছেন—ঢালা তৃতীয় শ্রেণীতে।

গ্রামে পৌঁছুতে সারা অঞ্চলের লোক—একেবারে ঝেঁকে এলো নতুন বৌ দেখ্‌তে। সেই রূপ-বিশ্লেষণ প্রতিযোগিতায় মেজবৌদি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিল একথা মনে আছে !

বৌ-বরণ করবার সময় নতুন বৌকে বাড়ীর লোকের কানে মধু দিতে হয় আঙুলে করে। তার মানে হচ্ছে এই যে, সবাই যেন নতুন বৌয়ের কথা মধুর মতো মিষ্টি শোনে।

নতুন বৌ ঘোম্‌টার ফাঁকে আমার সঙ্গে খুব গল্প করছে দেখে—আমাদের বড় বৌঠান শাসন করতে এগিয়ে এলেন। তিনি ফতোয়া জারি করলেন, নতুন বৌ বাড়ীতে পা দিয়েই দেওরের সঙ্গে কথা বল্‌বে কেন ? আমরা দেওরদের সঙ্গে কথা বলেছি—কত বছর পরে। সেই সঙ্গে একটি ছড়াও তিনি কাট্‌লেন—

"গাছের শত্রু লতা
বৌয়ের শত্রু কথা।"

শুনে আমি পালাতে পথ পাই না !

অবশ্য আমার মা'র মধ্যস্থতায় বৌয়ের কথা বলা বন্ধ হয়নি। মা কিন্তু বৌদের নাম ধরেই ডাক্‌তেন। চারু, নলিনী, সুধা—সরাসরি এই ভাবেই তিনি ডাক্‌তেন বাড়ীর বৌদের।

বৌরাও ছোট খুড়িমা বলতে একেবারে অজ্ঞান ছিল !

আমাদের বান্টু ঠাকুর্দ্দা বরযাত্রী হয়ে মোট বয়ে কুঁজের

ব্যথায় যে কষ্ট পেয়েছিলেন—তার শোধ তুলেছিলেন মেজদার বৌভাতের ভোজে সামাজিক ঘোঁট পাকিয়ে। গরম পোলাও-মাংস ধূমায়িত, নানারকম মাছ উদরে প্রবেশ করবার জন্যে আকুল, দৈ, ক্ষীর, চমচম—ভাঁড়ার ঘরে গম্‌গম্‌ করছে। গ্রামস্থ ভদ্রলোকও আসন গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত—এমন সময় বান্ধু ঠাকুর্দ্দা—কি এক সামাজিক প্রশ্ন তুলে বল্লেন, আমরা এর মীমাংসা না হলে হলে কেউ অন্নগ্রহণ করবো না।

সেই সঙ্গে পোঁ ধরলেন—নয়াবাড়ীর অনুকূলবাবু।

পরে অবশ্য বোঝা গিয়েছিল যে, ওঁরা এই জাতীয় সামাজিক একটা গোলমাল পাকাবার জন্যে আগে থেকেই মহলা দিয়ে এসেছিলেন।

সেই তর্ক আর শেষ হয় না।

ওদিকে পোলাও ইটের ঢেলা হয়ে উঠল, মাংস ঠাণ্ডা মেরে গেল, তরী-তরকারীতে মাছি পড়তে লাগল—গ্রামস্থ লোকের পেটে ক্ষিদের ইঁদুর ডন্‌ মারতে সুরু করল, তবু কিছু মীমাংসা হয় না!

তরুণ দল অবশ্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল—চট্‌পট্‌ পাতে বসে—সপাসপ্‌ ডান হাতের কাজ চালিয়ে যেতে—! কিন্তু পল্লী-সমাজের ধূরন্ধরেরা পাঁতি না দিলে ত' পাতে বসা যায় না!

শরৎচন্দ্রের পল্লী-সমাজের সমাজপতির দল যে বাঙলা দেশের সব গ্রামেই মাকড়শার জাল বিছিয়ে বাস্তুঘুঘুর মতো বসেছিলেন সেটা বুঝতে পেরেছিলাম অবশ্য অনেক বড় হয়ে।

কিন্তু মেজদার বৌভাতের অমন গরম গরম ভোজটা যে মিয়িয়ে গিয়েছিল—সে দুঃখের কথা অনেকদিন ভুলতে পারিনি!

সেদিন অনেক রাত্রে কিছু কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণা হিসেবে জমা দেবার পর গ্রামস্থ ব্যক্তিরা ঠাণ্ডা পোলাও-এ ক্ষুন্নিবৃত্তি করবার সুযোগ পায়।

একবার হঠাৎ আমাদের সখ হল—একটি পাঠাগার গড়ে তুলতে হবে গ্রামে। সঙ্গে সঙ্গে তার পরিকল্পনাও ঠিক হয়ে গেল।

আমিই প্রথমে প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছিলাম। তাই উৎসাহ আমার সব চাইতে বেশী। নিজের বাড়ীতে যত বই ছিল—সব একটা ঝাঁকার মধ্যে তুলে—পাঠাগারের উদ্দেশ্যে প্রথম অঞ্জলি অর্পণ করলাম।

এতে খুব ভালো ফল হয়েছিল।

বন্ধু-বান্ধব—খেলার সাথী—যার কাছে যত বই ছিল—সব এনে হাজির করল।

তার ফলে দেখা গেল, একদিনের মধ্যেই আমাদের একটি ছোটখাটো গ্রন্থাগার গড়ে উঠল।

এখন এই গ্রন্থাগারের নাম কি দেয়া হবে—তাই নিয়ে ছেলে মহলে আলোচনা স্বরু হল। আমাদের গ্রামে হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন নামে এক নামকরা পণ্ডিত ছিলেন।

শেষকালে ঠিক হল—তাঁর পুণ্য-নাম অনুসারে পাঠাগারের নাম রাখা হবে—"হরিশ পাঠাগার।"

পরবর্ত্তীকালে এই পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সকল দিক দিয়ে পাঠাগারটি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল। ছোটদের বই, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ, নাটক, প্রবন্ধ, ধর্ম্মগ্রন্থ, পুরোণো পুঁথি—অনেক কিছু এখানে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। আরো পরে এই পাঠাগারের নতুন নাম হয় বিজয় পাব্লিক লাইব্রেরী এবং বীরেন্দ্র সিংহ নিয়োগী চৌধুরীর দান করা জমিতে এর নিজস্ব গৃহও নির্ম্মিত হয়। তখন সমগ্র টাঙ্গাইল মহকুমার মধ্যে এটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার। কল্‌কাতা থেকে বহু সাময়িক পত্র, পূজাবার্ষিকী ইত্যাদিও এখানে সযত্নে রক্ষিত হত। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাকিস্তান হবার পর এমন সুন্দর পাঠাগারটি একেবারে উঠে গেছে।

আমাদের ছেলেবেলায় একবার বীরেন কাকা আমাদের উৎসাহিত করে তুল্লেন, সংগঠনমূলক কাজ করতে হবে।

সেই সময় গ্রামের কালীবাড়ী একেবারে ধ্বসে পড়ে যাচ্ছিল। বীরেন কাকা বল্লেন, ছেলেরা যদি নিজেরা মাটি কেটে কালী বাড়ীর

সংস্কার-সাধন করে তবে বিশেষ কিছু খরচও হবে না, অথচ সকলের সমবেত চেষ্টায় কালীবাড়ী রক্ষা পেয়ে যায়।

এই প্রস্তাবে সবাই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল।

নানা বাড়ী থেকে সংগ্রহ করা হল—কোদাল আর ঝুড়ি। ছেলেরা দল বেঁধে নিজেরাই মাটি কাট্‌ছে, আর নিজেরাই মাথায় করে এনে সেই মাটি কালী বাড়ীর উঠোনে ফেল্‌ছে। এইভাবে কয়েকদিনের আন্তরিক পরিশ্রমে সেবার আমরা কালীবাড়ীকে নতুন করে গড়ে তুল্‌তে পেরেছিলাম!

এই উপলক্ষে সকলকার শ্রমের মর্য্যাদা বোধ হয়েছিল।

এ ছাড়া আমরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে পুকুরের পানা সাফ করতাম। হাতে কাজ চল্‌ত, আর মুখে চলত গান। আমরা সবাই মিলে নৌকোয় চড়ে এই কাজ স্বরু করে দিতাম। পুকুর আর ডোবা থেকে পানা তুলে নৌকোগুলো ভর্ত্তী করে ফেল্‌তাম। পরে সেই পানাগুলি উঁচু জমিতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেয়া হত। শুক্‌নো পানাগুলি জমির সার হত।

কালী বাড়ীতে মাটি তোলা উঁচু জায়গায় আমরা একবার সমবেত প্রচেষ্টায় সুন্দর একটি বাগানও তৈরী করেছিলাম।

আমাদের পাঁটা চুরির কাহিনীটি এক সময়ে গ্রামে অমরতা লাভ করেছিল। সেই গল্পটি এখন বলছি।

তারিণী গুপ্ত মশায়ের তখন গ্রামে খুব বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা। গ্রামের যত উড়ে ঠাকুর—সবাইকার আস্তানা এই গুপ্ত বাড়ীতে। সবাই কানাকানি করত গুপ্ত মশায়ের অনেক টাকা তাই বাড়ীতে বহু-লোককে আশ্রয় দিয়েছেন।

এই উড়ে ঠাকুরের দল—সন্ধ্যে থেকে এমন চীৎকার করে তাস খেল্‌তে স্বরু করত যে, চোর-ডাকাত সে বাড়ীর কাছে ঘেঁস্‌তে পারত না।

এই তারিণী গুপ্ত মশায়ের বাড়ীতে ছিল একটি তরুণ নধর পাঁটা।

সেনেদের বাড়ীর তৃণে ঢাকা একটি অঞ্চলে প্রতিদিন এই পাঁটাটাকে বেঁধে রাখা হত। সে ব্যাটা ত' মহানন্দে ঘাস খেতো, এদিক-ওদিক ঘুরতো আর ব্যাঁ-ব্যাঁ চীৎকার করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

সেনেদের বাড়ীর সীতেশ একদিন সরাইকে জানিয়ে দিলে এই মুখরোচক খবরটি।

তাইত! এই নধর ছাগ-নন্দন আমাদের বঞ্চিত করে কার উদর পূর্ত্তির জন্যে গোকুলে বাড়ছে? আমাদের দলের ভোজন-বিলাসীর দল চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। এর ভেতর অতি উৎসাহীও কেউ-কেউ ছিল। একজন ত' সরাসরি গুপ্ত মশাইকে বলেই বস্‌ল, আপনার পাঁটাটার আমরা ভবলীলা সম্বরণ করবো।

তারিণী গুপ্ত মশায়ের একটি মুদ্রাদোষ ছিল। তিনি কথা বল্‌তে সুরু করেই আগে বল্‌তেন—বচনা করো—। অর্থাৎ বিবেচনা করো।

সেই অতি উৎসাহী ছেলেটির কথা শুনে তারিণীবাবু দাড়ি নেড়ে উত্তর দিলে, বচনা করো—, যদি তোদের মুরোদ থাকে ত' খাস আমার পাঁটা।

এই ঘটনাটি পল্লবিত হয়ে যখন আমাদের আসরে এসে পৌঁছুলো তখন সবাইকার সম্মানে বড় আঘাত লাগ্‌ল! কী! এমন কথা!

একেবারে আমাদের মুরোদ তুলে কথা।

নাঃ, সহেনা—সহেনা—দারুণ এ অপমান!

যাত্রাদলের গিরির মতো সবাই হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল।

—যে করেই হোক—এই নধর পাঁটা চুরি করে খেতে হবে। মেঘু সর্দ্দার আমাদের দলের একজন উল্লেখযোগ্য সভ্য। দেখ্‌তে যেমন কালো, আবাব তার গায়ে জোরও তেমনি। আবার সে যখন গান গায়—তখন তার নিজেরই ধারণা যে, এমন সুরেলা কণ্ঠ আর কারো নেই!

এই গান গাওয়া নিয়ে মেঘু সর্দ্দারের সঙ্গে আমার প্রায়ই প্রতিযোগিতা চলত। আমার আবার ধারণা ছিল যে, মেঘু সর্দ্দারের

চাইতে আমি ভালো গাইতে পারি! সুতরাং সঙ্গীত প্রতিযোগিতা যে সুরু হয়ে যাবে—তাতে আর বিচিত্র কি!

কিন্তু সেই সঙ্গীত প্রতিযোগিতার শ্রোতা হিসেবে অনেকের কর্ণ পটাহই যে ছিন্ন হবার উপক্রম হত—সেদিকে আমাদের বিন্দু মাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না! এ একেবারে ভীষ্ম লোচন গাইছে ভীষণ গোছের অবস্থা!

এমন যে জাঁদরেল মেঘু সর্দ্দার সে একেবারে ক্ষেপে গেল—ছলে-বলে কৌশলে এই পাঁটার মাংস খেতেই হবে।

ছেলে-মহলে গোপনে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

মাখন বল্লে, ও পাঁটা সরানো আর এমন শক্ত কি? তোমরা বলো, একদিন রাত্তিরে গিয়ে—

সীতেশ চোখ দুটো নাচিয়ে মন্তব্য করলে, ওই রাখাল ছোঁড়াটার হাতে চার আমার পয়সা গুঁজে দিলেই সে আর কোনো শব্দ করবে না।

চারু আস্ফালন করে বল্লে, ওকে এক কোপে সাবাড় করবার ভার কিন্তু আমি নেবো।

মেঘু সর্দ্দার লাফিয়ে উঠে প্রতিবাদ জানালে, আমি থাক্‌তে তুমি কেন বাপু?

সবাইকার গলা উচ্চগ্রামে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

কেমন করে যেন এই খবরটা তারিণী গুপ্ত মশায়ের বাড়ী গিয়ে পৌঁছুলো যে, গাঁয়ের ছেলেরা তাঁর নধর পাঁটাটির ভবলীলা সাঙ্গ করবার ফিকিরে আছে।

পাশের গ্রাম সন্তোষ। সেখানে তাঁর জামাই প্রমথবাবু নায়েবী করেন। তারিণীবাবুর মেয়েরা পরামর্শ দিলেন, ওইখানে তুমি পাঁটাকে চালান করো—দেখি ছেলেরা কেমন করে ওটাকে খায়।

যে কথা, সেই কাজ।

রাতারাতি জামায়ের কাছে চলে গেল সেই নধর পাঁটা।

এদিকে ছেলেদেরও রোখ চেপে গেছে। প্রথমে, আমাদের মুরোদ

তুলে কথা বলা ; তারপর আবার সবাইকে ফাঁকি দিয়ে জামাই বাড়ী ছাগ-নন্দন চালান ! আর ওকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। পরমায়ু ওর শেষ হয়ে এসেছে।

ছেলেদের গোপন বৈঠক বসল।

সীতেশ, মাখন, চারু, কান্তি এরা সব উৎসাহের সঙ্গে বল্লে যে, রীতিমত গোয়েন্দা লাগিয়ে জান্‌তে হবে—প্রমথবাবুদের বাড়ীর কোন ঘরে পাঁটাটাকে রাত্তিরে বেঁধে রাখা হয়।

খবর পেতেও বেশী দেরী হল না।

ও বাড়ীতে একটি ছেলে থেকে পড়াশোনা করে। সে থাকে বাইরের ঘরে। সেইখানেই রাত্তিরে পাঁটাটাকে বেঁধে রাখা হয়।

চুপ ! চুপ ! চুপ !

খুব গোপনে ষড়যন্ত্র করা হল। কেননা—দেয়ালেরও কান আছে। সীতেশ আর মাখন মুখরোচক খবর নিয়ে এলো। ছেলেটীর সঙ্গে ওরা ভাব জমিয়ে এসেছে। কোথায় নাকি যাত্রা হবে, তাই ছেলেটি সে রাত্রে ঘরে থাক্‌বে না।

এই হচ্ছে সুবর্ণ-সুযোগ।

ছেলেমহলে আবার সাজ-সাজ রব পড়ে গেল !

কারা নৌকো করে মাঝ পথে অপেক্ষা করবে, কে কে সরাসরি সন্তোষ গিয়ে পাঁটাটাকে অপহরণ করবে, পথে পথে কারা প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্যে এখানে-ওখানে-সেখানে মাঠের ধারে, গাছের তলায় আর খেয়া-ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে—অতি গোপনীয় রণ-কৌশল হিসেবে সব ঠিক হয়ে গেল।

সীতেশ আর মাখন সব চাইতে তুখোড়। ওরা একেবারে চলে যাবে তারিণী গুপ্তের জামাই বাড়ী।

যুদ্ধের ব্যাপারে যেমন নানারকম অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হয়—এই ছাগ-নন্দন অপহরণ কার্য্যেও নানাজাতীয় টোট্‌কা অষুধের দরকার। যথা—সরষে আর সরষের তেল। পাঁটার জিবে যদি সরষের তেল লাগিয়ে দেয়া হয়—তবে নাকি শ্রীমান আর ডাকে না। আর একটি

টোট্‌কা ওষুধ আছে। পাঁটার কানে সরষে ঢেলে যদি কচুপাতা গুঁজে শুইয়ে রাখা হয় তাহলেও নাকি ওর চ্যাচামেচি বন্ধ থাকে।

এই সব অব্যর্থ মহৌষধি সংগ্রহ করে মাখন আর সীতেশ সন্তোষ রওনা হয়ে গেল।

যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হবার মুখে সৈনিকদের যেমন বিদায় দেয়া হয়-- আমরাও তেমমি নীরব গাম্ভীর্য্যে ওদের দুজনকে রওনা করিয়ে দিলাম।

ওঠো জয় রথে তব—

জয় যাত্রায় যাও গো— !

এত শুধু পাঁটা চুরি নয়, এ যে আমাদের সবাইকার ইজ্জতের লড়াই।

আমাদের মুরোদ তুলে কথা বলেছেন—তারিণী গুপ্ত মশাই! সত্যি, মুরোদ আমাদের আছে কি না সেটা দেখিয়ে দিতে হবে বৈ কি!

সঙ্গে সঙ্গে আর একদল—ছোট-ছোট বৈঠে সংগ্রহ করে—নৌকো নিয়ে গাইজাবাড়ীর খাল ধরে গাছের ছায়ায় ছায়ায় সন্তোষ গাঁয়ে ঢুকে ঘাপ্‌টি মেরে বসে রইল। ওরা দু'জন যদি পাঁটা নিয়ে বেরিয়ে আস্‌তে পারে তবে—ওদের নৌকোয় তুলে নিয়ে একেবারে দে ছুট!

সীতেশ আর মাখন ওরা দু'জনেই সত্যিকারের ডানপিটে ছেলে। পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিনব কৌশলে—ছাগ-নন্দনকে—ঠিক বের করে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু সন্তোষ গ্রাম তখন লোকজন, পাইক-বরকন্দাজ, আমলা-গোমস্তায় একেবারে জম্‌জমাট। দুটো জমিদারী এষ্টেট একেবারে পাশাপাশি। ছয় আনি আর পাঁচ আনি।

সব সময়ই লোকজন চলাচল করছে।

তাদের মাঝখান দিয়ে পাঁটাটাকে ত' আর টেনে হিঁচড়ে আনা চলে না! কাজেই মাখন আর সীতেশ শ্রীমানকে পাঁজাকোলে করে হাঁট্‌তে লাগ্‌ল। কখনো মাখনের কোলে কখনো সীতেশের কোলে ছাগ-নন্দন চুপচাপ শুয়ে রইল। কেন না টোট্‌কা অষুধগুলি আগেই ব্যবহার করা হয়েছে।

তড়িৎগতিতে কাজ সমাধা করতে হবে! তাই সীতেশ আর মাখন কারো জন্যে অপেক্ষা না করে জল ঝাঁপিয়ে, সাঁত্রে পাঁটাটাকে নিয়ে নিরাপদ অঞ্চলে চলে এলো।

এইবার আমাদের সংগ্রামের ২য় ঘাঁটি হল—সাকরাইল স্কুল। ইতিমধ্যে কাকের মুখে খবর পেয়ে স্থলবাহিনী, জলবাহিনী সবাই এসে জমায়েৎ হয়েছে—ইস্কুল বাড়ীর পেছন দিকে।

ওখানে একটি ডোবা ছিল। আমরা সেই ডোবার ধারে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মশার কামড় খাই, আর মনে মনে ফন্দী আঁটি।

মেঘু সর্দ্দার বল্লে, আর ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। ওরা জান্তে পারলে নিশ্চয়ই এই গাঁয়ে খবর নিতে লোক পাঠিয়ে দেবে। তোমরা একজনে পাঁটার গলায় দড়ি বেঁধে ডোবার জলের দিকে টেনে ধরো, আর আমি এক কোপে বাছাধনের ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিই।

মেঘু সর্দ্দার ঠিক পরামর্শই দিয়েছিল। কেননা—ভাবনা-চিন্তার সময় তখন ছিল না। কোত্থেকে খড়্গের যোগাড় হয়ে গেল। আর হবেই বা না কেন? যে গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ীতে দুর্গা পূজো হয়—সেখানকার ছেলেরা রাত্তিরের আঁধারে একটি খড়্গ জোগাড় করতে পারবে না?

বদনদা তখন এগিয়ে এসে পরামর্শ দিলে, তাই ভালো। মেঘু সর্দ্দার তোমার কাজ সারো। তারপর মাংস নিয়ে সোজা চলে যাবো আমাদের বাড়ী। ওরা যদি পাঁঠা খোয়া যাবার খবরও পায় তবে খোঁজ করবে এসে পূবপাড়ায়। পশ্চিমপাড়ার কথা ওদের একবারও মনে হবে না। আমি সরাসরি কাটা পাঁঠা নিয়ে সরে পড়ি। ওরা বুঝতেও পারবে না—সে পাঁটা কোথায় আছে!

উৎসাহী মেঘু সর্দ্দার অন্ধকারের মধ্যেই তার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে ফেল্লে।

তারপর বদনদা সেই কর্ত্তিত অজ নিয়ে নৌকোযোগে চলে গেল পশ্চিমপাড়া।

এদিকে সীতেশের চোখে ঘুম নেই।

তাদের সেন বাড়ীর পাশেই—গুপ্তবাড়। কখন ওরা খবর পায়, কখন ওদের লোকজন এসে চড়াও হয়—সেই চিন্তায় সে কেবলি ঘর-বার করতে লাগ্‌লো।

শেষ পর্য্যন্ত দুর্নিবার লোভে তার ভয়কে সে জয় করলে। ওই আনা-গোনার ফাঁকে-ফাঁকে সে লঙ্কা, হলুদ, তেল ঘী ইত্যাদির কথাও ভাবতে লাগলো।

সেন বাড়ীতেই একটি দোকান ছিল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল—যে ছেলেটি রাত্তিরে দোকান ঘরে শুয়ে থাকে—সে আজ নেই, দেশে না কোথায় চলে গেছে!

এত রাত্তিরে এখন উপায়!

মুকুলদের বাইরের বৈঠকখানা ঘরে আমাদের নীরব বৈঠক বসেছে। কারো মুখে আর টু শব্দটি নেই!

রাত্রি ক্রমে গভীর হতে থাকে।

বাইরে ঝিঁঝির ঐক্যতান দ্রুততর হয়ে ওঠে। দূরের বনে শেয়াল প্রহর ঘোষণা করে···কিন্তু এই কটি কিশোরের চোখে ঘুম নেই!

শেষ পর্য্যন্ত আমরা ঐখানেই সে রাত্তিরের মতো মাছ-পাতুরী হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

গভীর রাত্রে আমাদের সবাইকার ঘুম ভেঙে গেল—বদনদার চাপা গলার ডাকে।

—ওরে, ওঠ্ তোরা, শীগ্‌গির—

—কি ব্যাপার? ওরা জান্‌তে পেরেছে নাকি?

বদনদা যা বল্লে, তার সারমর্ম্ম হচ্ছে এই যে, সন্তোষের লোকেরা নাকি টের পেয়েছে। পাঁটার মাংসের যা হোক কিছু' ব্যবস্থা আজ রাত্রেই করে ফেল্‌তে হবে। কেননা, ধরা পড়বার বিশেষ সম্ভাবনা। যদি রান্না করতে হয় ত' এক্ষুণি রান্না চাপাতে হবে।

কিন্তু এমন যে করিৎ-কর্ম্মা সীতেশ তার মুখেও কোনো সাড়া-শব্দ নেই!

কোথায় বাসন-পত্তর, কোথায় ঘী-তেল-মশলা···কোথায় উনুন-কাঠ-কেরোসিন ?

একজনে প্রস্তাব করলে, নৌকোতে নিয়ে গিয়ে রান্না চাপালে মন্দ হয় না।

প্রস্তাবটি অবশ্য ভালো, কিন্তু আনুষঙ্গিক ব্যবস্থ না থাক্‌লে কিছুই করবার যো নেই।

বদনদা' হতাশ হয়ে বললে, তাহলে উপায় ? আমাদের বাড়ীর কর্ত্তারা জান্‌তে পারলে আমাকে একেবারে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। আমরা যে পাঁটা নিয়ে এসেছি তার কোনো প্রমাণ রাখা চলবে না। আজ রাত্তিরেই একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেলতে হবে!

সীতেশ মুখ চট্‌কে উত্তর দিলে, তাইত! এমন পুরুষ্টু নধর পাটা, হাতে এসেও শেষ পর্যন্ত তা দিয়ে পেট-পূজো হবে না ?

বদনদা তখন একেবারে মরিয়া হয়ে গেছে।

বল্লে, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিনে। পাছে কেউ সন্দেহ করে তাই এক্ষুনি আমাকে বাড়ী ফিরে যেতে হবে।

—কিন্তু ওই মাংস ?

—যাবার সময় থলেতে বেঁধে ধোপা-দর খালে ডুবিয়ে দিয়ে যাচ্ছি!

সবাই আঁৎকে উঠে আর্ত্তনাদ করে উঠল, কী সর্ব্বনাশ!

শেষ পর্য্যন্ত সেই নধর পাঁটার মাংস ধোপা-দর খালেই বদনদা বিসর্জ্জন দিয়েছিল!

এই পাঁটা চুরির কাহিনীটা কিছু অদল-বদল করে আমার লেখা 'বেপরোয়া' উপন্যাসে দিয়েছি।

আমার শৈশবের কাহিনী লিখতে গিয়ে—আগের গল্প পরে এবং অনেক পরের গল্প আগে এসে পড়েছে সেকথা আমি সুরুতেই বলে রেখেছি। আমার মনের-পটে যে কাহিনীগুলি উজ্জ্বল হয়ে আছে

সেইগুলিই আমি শুনিয়েছি সবাইকে। কিন্তু কোনো ঘটনাকেই অতিরঞ্জন করা হয়নি।

কি ভাবে আমি গ্রাম ছেড়ে একদিন শহরের দিকে পাড়ি জমালাম —সেই কাহিনীটিই এখন মনে পড়ছে।

আমার মামা কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের কাছে পাঠ সাঙ্গ করে স্থির করলেন, কল্‌কাতাতেই কব্‌রেজি ব্যবসা সুরু করবেন।

হঠাৎ গ্রামে খবর এসে পৌঁছুলো—মামা তেতলা বাড়ী ভাড়া করেছেন। এক তলাতে থাক্‌বে ঔষধালয়, দোতলাতে থাক্‌বেন মামা এবং তেতলাতে থাকবো আমরা।

শুনেই আমার পড়াশোনা মাথায় গিয়ে উঠ্‌ল! তেতলার ওপরে আমরা থাকবো, কল্‌কাতার ইস্কুলে পড়বো—সে যে কী আনন্দের ব্যাপার হবে—সঙ্গী-সাথী কাউকে ঠিক বুঝিয়ে বল্‌তে পারিনে! মনে হল—খুব খানিকটা লাফাই আর ডিগ্‌বাজি খাই।

আমাদের সুরেশদা তখন সাকরাইল মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক। খুব যত্ন নিয়ে তিনি আমাদের পড়াতেন। সেইবার আমাদের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেবার বছর। আমার ওপর সুরেশদার অনেকখানি ভরসা। তিনি মামাকে ধরে বসলেন, ও এই বছরটা আমাদের বাড়ীতে থেকে পড়াশোনা করুক। আমি নিজে ওর ভার নিচ্ছি। কথা দিচ্ছি আমি, ছাত্রবৃত্তি নিশ্চয়ই ও পাবে।

কিন্তু মামা কিছুতেই রাজী নন! আমাদের কল্‌কাতায় নিয়ে আস্‌বার সমস্ত ব্যবস্থাই করে ফেলেছেন।

কল্‌কাতা শহর দেখতে পাবো—তার আনন্দ কি কম? রাত্তিরে আমার ঘুম নেই। ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখি—হাজার হাজার উঁচু উঁচু বাড়ী—তারই একটা তেতলা বাড়ীতে আমি রয়েছি। কত লোকজন গাড়ী, ঘোড়া।

আবার এই চির-পরিচিত গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে—তার বেদনাও মনকে ক্ষণে-ক্ষণে দোলা দিতে থাকে!

এই মাঠ-ঘাট, বন বাদড়ে! এই চির-চেনা পাখী-ডাকা ফুল-ফোটা, ছায়ায়-ঢাকা পল্লী-পথ—আমায় পেছু টান্‌তে লাগলো।

নয়া বাড়ীর বিল, মুন্সী-বাড়ীর নহবৎ খানা, গাইজা বাড়ীর খাল, দিগন্ত প্রসারিত ধানের ক্ষেত, এমন কি ইস্কুলের কৃষ্ণচূড়ার ডালটি অবধি মাথা নেড়ে-নেড়ে আমায় পিছু ডাক্‌তে লাগলো। বললে, যেতে নাহি দিব!

কিন্তু তবু ত চলে আস্‌তে হল।

এক ঝিল্লি-মুখরিত সন্ধ্যায় মা ও দাদার হাত ধরে নৌকোয় উঠলাম।

পেছনে পড়ে রইল আমার শৈশবের চির-চেনা গ্রাম, আর সাম্‌নে স্বপ্ন-রচনা করতে লাগলো কল্‌কাতার আলোকোজ্জ্বল রাজপথ!

তখন আমার এক চোখে হাসি আর এক চোখে অশ্রু।

ইতি—